ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১২ সংখ্যা ।। ২৯ কার্তিক, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৬ নভেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

কেন্দ্র-রাজ্য নির্বিকার

গূঢ়পুরুষ।। কোনটা বড় সমস্যা, মাওবাদী সন্ত্রাস অথবা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ-ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি? বিমানবাবু-বুদ্ধবাবুরা বলছেন মাওবাদী সন্ত্রাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন মাওবাদ-মার্কসবাদ একই মুদ্রার দুই পিঠ। এই দুই বাদীদেরই রাজ্য থেকে চিরতরে উৎখাত করতে হবে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সমস্যাটি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বাম জোট অথবা কংগ্রেস-তৃণমূলের বিরোধী জোট কোনও পক্ষেরই কাছে তেমন জরুরী বিষয় নয়। অথচ সারা রাজ্যের ৯৫ শতাংশ মানুষ এখন দু'বেলা পরিবারের অন্ন যোগাতে হিমসিম খাচ্ছেন। বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দার বাজারে কর্মসংস্থানের দরজা প্রায় বন্ধ। যে গতিতে প্রতি সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে সারা দেশজুড়ে তার তুলনায় পরিবারের উপার্জন বৃদ্ধি হচ্ছে না। শুধু নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ইত্যাদি সর্বস্তরেই খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়েই চলেছে। মূল্যবৃদ্ধির এই জরুরী বিষয়টিকে রাজ্যের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী জোট কেউই পাত্তা দিচ্ছে না।

প্রণব মুখার্জী

নরেন দে

মাওবাদী সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গের দুটি বা তিনটি জেলায় যতটা প্রবল ততটা অন্যত্র নয়। কিন্তু খাদ্যবস্তুর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-দক্ষিণ সব জেলার মানুষই এখন মরতে বসেছে। সারা রাজ্যজুড়ে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনাচ্ছে। এই ক্ষুধার্ত অসহায় রাজ্যবাসীর কথা বুদ্ধ-মমতা কেউই বলছেন না। মমতা বলেই দিয়েছেন তিনি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কোনও আন্দোলনে যাবেন না। কারণ, এমন আন্দোলন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ও ইউ পি এ জোট সরকারকে বিব্রত করবে। তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস ইউ পি এ জোটের অন্যতম প্রধান শরিক। তাই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার দায় তৃণমূলের ওপরেও বর্তায়। অন্যদিকে রাজ্যের বামদলগুলির এখন দিশাহীন অবস্থা। তাদের কাছে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নয়, তৃণমূল ও মাওবাদীদের বরবাদ করাই একমাত্র লক্ষ্য।

সারা ভারত জুড়েই খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে গত বছরের তুলনায় ৭০ শতাংশ। চলতি খরিফ মরশুমে সারা দেশে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন হবে ৬৫ মিলিয়ন টন। যা গত বছরের তুলনায় ২০ মিলিয়ন টন কম। এই কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার। তাঁর বক্তব্য, কিছু রাজ্যে খরা পরিস্থিতি এবং কয়েকটি রাজ্যে অতিবৃষ্টি এর জন্য দায়ি। যেমন,

(এরপর ৪ পাতায়)

আম-জনতা নাজেহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুই প্রাক্তন ও বর্তমান অর্থমন্ত্রীর ভেল্কিবাজিতে এবছরের গোড়ায় যেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার ১১-এর কাঁটা ছাড়িয়ে ১২টা বাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সেখানে আচমকা লোকসভা নির্বাচনোত্তর মুদ্রাস্ফীতির হার কমতে কমতে একেবারে মাইনাস পেরিয়ে গিয়েছিল। অথচ লোকসভা নির্বাচনের পরেই গত জুন মাসে একদফা মূল্যবৃদ্ধি হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। এবার তিন রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ঠিক পরেই এই বছরে দ্বিতীয়বারের জন্য মূল্যবৃদ্ধি ঘটল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের।

অর্থনীতির যে-কোনও পড়ুয়া- এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই এমনকী সমস্ত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছেও এই বছরটা অর্থাৎ ২০০৯ সালটা অর্থনৈতিক ভেল্কিবাজির কারণে হয়তো চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ভেল্কিবাজির মুখ্য তিন কারিগর---এক, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যিনি পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন-পূর্ব কিছু সময়ের জন্যে ডি-ফ্যাক্টো অর্থমন্ত্রী ছিলেন, দুই---বর্তমান অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, তিন---বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও একদা অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। এই থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের কমন ফিচার্স---এঁরা সকলেই কোনও না কোনও সময় দেশের অর্থমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। আরও একটা সাধারণ বৈশিষ্ট--এঁরা সকলেই অর্থনীতির ছাত্র। বিশেষ করে এঁদের ম্যাডাম (অর্থাৎ সোনিয়া গান্ধী) মনমোহন সিং-কে অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত হিসেবে বরাবর দাবী করে থাকেন।

ভোটের রাজনীতি ও এই অর্থনৈতিক মেলবন্ধনের এরকম নজির ভূ-ভারতে আর কোথাও মিলবে বলে মনে হয় না। এই মেলবন্ধনের পুরো কৃতিত্বটাই বর্তাচ্ছে মনমোহন-প্রণব-চিদম্বরমের ওপর। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশে সরকারি কর্মচারীদের মাইনে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু অর্থের অভাবে সরকারের অধিকাংশ দপ্তরেরই প্রায় দেউলিয়া অবস্থা। এই অবস্থা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বাজেটে স্রেফ ভোট ব্যাঙ্ক রক্ষার কারণে অর্থনৈতিক সংস্কারের রাস্তায় হাঁটেননি ওই তিন ভেলকিবাজ। তা সত্ত্বেও তাঁদের ভেল্কিতে মুদ্রাস্ফীতি কমেছে এবং একবার নয় দু' দুবার অগ্নিমূল্যে পরিণত হয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন এবং অর্থমন্ত্রী প্রণব বারংবার আশ্বাস দিয়েছেন দাম কমবে বলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে দাম তো কমেইনি উলটে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এঁরা সবচেয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন আলুর ক্ষেত্রে। একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বে-আইনি মজুতদারীর জন্যেই দাম বাড়ছে আলুর। তা সত্ত্বেও হিমঘর মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। স্রেফ হুমকি দিয়েই ছেড়ে

(এরপর ৪ পাতায়)

অগ্নিমূল্যেরও অগ্নিমূল্য

দ্রব্য	জুন, '০৮	জুন, ২০০৯	অক্টোবর, ২০০৯
চাল	১৭.৫০	১৭.০০	২২.৫০
আটা	——	১৩–১৪	১৮–২০
চিনি	১৮.০০	২৮.০০	৪০.০০
অড়হর ডাল	৪৬.০০	৬৩.০০	৮৯.০০
গোটা মুগ	৩৬.৫০	৫২.৫০	১০০.০০
কালো মুসুর	৪৯.৫০	৫৩.০০	৫৬.৫০
কলাই ডাল (ধোয়া)	৩৯.০০	৪৭.০০	৭০.০০
কলাই ডাল (গোটা)	৩৪.০০	৩৮.৫০	৫৮.০০
হলুদ গুঃ (২০০ গ্রাঃ)	১৬.৫০	২০.৫০	৩৮.০০
টোন দুধ ***	১৬.০০	২১.০০	২২.০০
আলু **	৮–১০	১০–১২	২২–২৬
পেঁয়াজ **	১০–১১	১২–১৪	২৮–৩৩
লাউ **	১০–১২	১৬–১৮	৩০–৩৬
কড়াইশুঁটি **	১৬–২০	৩০.০০	৬০–৮০
ফুলকপি	১২–১৫	——	৩৫–৪০

* একমাত্র হলুদ বাদে প্রতিটি দ্রব্যের মূল্যই প্রতি কেজি, প্রতি লিটার টাকার অঙ্কে করা হয়েছে।

** খুচরো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই হিসেব।

নজিরবিহীন মুসলিম তোষণ

পাঁচ লক্ষ মুসলিমকে চাকরির প্রতিশ্রুতি

মুকুল রায়
MUKUL ROY

Dated. 13th Aug. 09

To
Jb. Syed Modhu,
Village Teesa, PS Chanditala,
District. Hooghly.

Certified in appreciation, for Man, Mati and Manus.

Sir,

Your dedication for our Party, I have bounty with full of assurance to provide employments of about 5 Lakhs jobs to the Muslims' men and women of all aged in West Bengal which CPIM led government had continuously failed to protect fundamental right and employments of the Minority in all public sectors. However, for your said intimate, I authorised you to recruit [illegible] to the Muslim unemployed youth in your area for representation of employment in my Shipping ministry, Govt. of India

Personal regards,

Yours sincerely,

MUKUL ROY

সৈয়দ মধুকে লেখা মুকুল রায়ের চিঠির প্রতিলিপি।

দেবব্রত চৌধুরী ঃ কেন্দ্রীয় জাহাজ পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মুকুল রায় মহাশয় সরকারি নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আশোক স্তম্ভ সমন্বিত সরকারী প্যাডে মুসলিম তৃণমূল কর্মীকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে পাঁচলক্ষ মুসলিম পুরুষ ও মহিলাকে তিনি সরকারি চাকরি দেবেন। তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের নামে নামে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়ে এলাকার মুসলমান বেকারদের নাম জোগাড়ের দায়িত্বও দিয়েছেন।

হুগলীর চণ্ডীতলা এলাকার কাপাসহাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ মধু, যিনি আবার গোরুর ব্যবসায়ী ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। তাকে নাম ধরেই এবং সম্বোধন করেই এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। এলাকায় খবর নিয়ে জানা গেছে শুধু সৈয়দ মধুই নয়, চণ্ডীতলার কাপাসহাড়িয়া গ্রামের ও তিসা গ্রামের মধ্যেই পরিচিত তৃণমূলী-সমাজবিরোধী কর্মী আরসেদ, আসলামের মতো লোকজনও একাজে নেমে পড়েছে। আশ্চর্য স্থানীয় থানাতে দুষ্কৃতী, সমাজবিরোধী হিসেবে আরসেদের নাম ও ছবি জনগণের অবগতির জন্য টাঙানো আছে। কিন্তু এহেন সমাজবিরোধী হচ্ছে তৃণমূলকর্মী ও মন্ত্রী মকুল রায়ের ঘনিষ্ঠ। এদের সাহায্যেই ২০১১ সালে তৃণমূলীরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এইভাবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠি দিয়ে চাকরি দেওয়ার জন্য বেকার যুবকদের ধর্মের পরিচয়ে নাম

(এরপর ৪ পাতায়)

পাট শিল্পে বি এম এসের লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাট শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবীগুলি পূরণ এবং অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকদের দুর্বিসহ জীবনধারণের প্রতিকারের দাবীতে পাট শিল্পে আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০০৯ থেকে "ভারতীয় জুট মজদুর সঙ্ঘ" স্ববি. এম. এসব লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিল। গত ১ নভেম্বর, ২০০৯ বি. এম. এস. এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বি এম এস-এর বক্তব্য চটকল মালিকেরা রাজ্যের কম্যুনিস্ট সরকার ও কেন্দ্রের ইউ. পি. এ. সরকারের প্রত্যক্ষ ও খোলাখুলি মদতে শ্রমিকদের লাগাতার শোষণ করে চলেছে। ব্যাপক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও বকেয়া ৮৯৪ পয়েন্ট মহার্ঘ্য ভাতা, যা প্রতি মাসে ১১৯৮.০০ টাকা, তা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

পশ্চিম কলকাতায় গো-গ্রাম যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিশ্ব মঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার রথ কুরুক্ষেত্র থেকে রওনা হয়ে উত্তরবঙ্গে পরিভ্রমণ করে গত ২ নভেম্বর দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করে। ৩ নভেম্বর উত্তর কলকাতা বিভাগের উদ্যোগে রথ বিবেকানন্দ রোডে, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট, মালাপাড়া পরিক্রমা করে কলাকার স্ট্রিটের সত্যনারায়ণ মন্দিরে এসে পৌঁছায়। এদিন মন্দিরের পাশে এক জনসভারও আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তাদের বক্তব্যে পরিবেশ রক্ষা ও দেশের সমৃদ্ধির পিছনে গোরুর ভূমিকার কথা বারবার উঠে আসে। উপস্থিত জনতা গো-মাতার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে বক্তাদের বক্তব্যের সমর্থন জানান। বক্তাদের মতে, ভোগবাদী বা পশ্চিমী সংস্কৃতির ভাবধারা থেকে সমগ্র মানবজাতিকে কেবল গো-ভিত্তিক জীবনযাপনই বাঁচাতে পারে।

কলকাতার বড়বাজারে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা চলছে।

সভায় বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সর্বভারতীয় সভাপতি ডাঃ এইচ আর নাগেন্দ্র, সর্বভারতীয় সংযোজক শঙ্করলালজী, স্বামী দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, রামবিলাস বেদান্তী প্রমুখ। সভার সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত তিওয়ারী বলেন যে, সংবিধানে নির্দেশিত গো-হত্যা বন্ধে সরকার সক্রিয় নয়। সুপ্রীম কোর্টও গো-হত্যাকে আইনত নিষিদ্ধ করেছে।

গো-রক্ষার দাবীতে জনগণকে সচেতন করতে দেশজুড়ে প্রায় ২০ কোটি মানুষের হস্তাক্ষর সম্বলিত পত্র রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান শ্রীতিওয়ারী। এদিনের সভাতেও গো-হত্যা বন্ধের দাবীতে গণহস্তাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। উত্তর কলকাতা বিভাগের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিক সাধারণ মানুষের ঢল নামে। মা-বোনেদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরে দক্ষিণ কলকাতার সাউদার্ন পার্কেও বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা উপলক্ষে শঙ্খনাদ সমরসতা মিশনের উদ্যোগে কালুগাছিতে গো-পূজন।

বীরভূম জেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তরে ৪৮ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ

সংবাদদাতা।। একে মা মনসা তার ওপর ধূপের গন্ধ। অনেকটা সেরকমই ঘটল বীরভূমের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ৫ নভেম্বর আটচল্লিশ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠেছে।

২০০৮-০৯-এর ৮ মাসের হিসাব পরীক্ষায় এমনই গরমিল ধরা পড়েছে। দপ্তরের নিয়ম রীতি অনুসারে প্রতি বছর আগস্ট মাসে হিসাব খতিয়ে দেখে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের দপ্তর। অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল তহবিলে নগদ কত টাকা জমা আছে, সেই হিসাবে খতিয়ে দেখতে গেলেই তছরুপের কাণ্ড ফাঁস হয়ে যায়। তহবিলে মাত্র কুড়ি পয়সা জমা দেখতে পান তারা। এতেই সন্দেহ হয় কর্তৃপক্ষের। দফতরের উপ-অধিকর্তা নারায়ণ দাস ভৌমিক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরই সই জাল করে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। জেলা শাসকের নির্দেশে সিউড়ি থানায় এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই ঘটনার কোনও কিনারা করে উঠতে পারেনি।

এদিকে ঘটনা ঘটে গেলেও দফতরের কোষাধ্যক্ষ প্রসূন রায় কিছুই জানেন না। ফলে সন্দেহের পরিবেশ আরও গাঢ় হচ্ছে। বাবার অকাল মৃত্যুর পর তিনিই পিতৃসূত্রে পাওয়া চাকরির অধিকারী হন। ৫ নভেম্বর এই ঘটনার আগের দিন থেকে তিনি অফিসে আসেননি।

ঘটনার দিনও তিনি অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। এমনিতেই রাজ্যের প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কাজকর্মে খুশি নয় সাধারণ মানুষ। জেলাবাসীর অভিযোগ, দপ্তর গবাদি পশুর উন্নতিতে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। এরই মধ্যে এমন ঘটনায় কিছুটা হলেও রাজ্যজুড়েও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

মুসলিম তোষণ করতে গিয়ে বিপাকে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মানুষরা মা-মাটি-মানুষের নেত্রী তৃণমূলনেত্রীর কার্যকলাপে দারুণভাবে অসন্তুষ্ট। মমতা ব্যানার্জি মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা ইফতারের আগে মাথায় ফেট্টি বেঁধে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মুখ দেখাচ্ছেন। ঘাসফুল নেত্রী বরাবরই চটকদারী। সেই নেত্রী তথা রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আর এক কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছেন, যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরও ক্ষোভের কারণ হয়েছে। কলকাতার নেতাজী সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত ২৪ অক্টোবর, শনিবার এক সময় এক নারীমূর্তির গায়ে হজযাত্রার আবশ্যিক পোশাক (এহরাম) পরিচয়ে ওই মূর্তিটি প্রতিস্থাপন করেছেন মমতা ব্যানার্জি। আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রী মা-মাটি-মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ। মূর্তিটি বসানো হয়েছে, অস্থায়ী নামাজ কেন্দ্রে। শুধু তাই নয়, এই এহেরামে ছাপা হয়েছে তৃণমূলের দলীয় প্রতীক ঘাসফুল। ২৫ অক্টোবর রবিবার সকালে বিষয়টি অনেকের নজরে আসে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হজযাত্রী। সকালে তারা বিমানবন্দরে পৌঁছে যখন নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যাত্রার তখন দেখেন সৌজন্যরহিত এই দৃশ্য। তারা অনেকেই এই ইসলাম বিরোধী অভব্যতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা হজ কমিটির সভাপতি সৈয়দ মহঃ মসীহর কাছে জানতে চান এই সব কি হচ্ছে? ইসলাম ধর্মে কোনও মূর্তির স্থান নেই। হজ যাত্রার প্রাক্কালে নামাজ পড়ার সময় ওই এহেরাম পরা ঘাসফুল হাতে নারী মূর্তি তাদের অস্বস্তির কারণ হয়। এই খবর জানার পর জমিয়ত-উলেমা-এ-হিন্দের রাজ্য সম্পাদক মাতুর সিদ্দিকুল্লা সাহেব তীব্র প্রতিবাদ করেন। তার মতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামের অবমাননা করা হয়েছে। এব্যাপারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে প্রতিবাদের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। জমিয়ত উলেমা বাংলার রাজ্য সম্পাদক সৈয়দ বাহাউদ্দিন বলেছেন, ইসলামে মূর্তির কোনও স্থান নেই---এই মূর্তি বসিয়ে ধর্মপ্রাণ ইসলামীদের মনে আঘাত করা হয়েছে। এ রাজ্যে সংখ্যালঘু মানুষদের মনে হচ্ছে পীরজাদা সিদ্দিকী তৃণমূলের দালালি করছেন কীসের লোভে? এভাবে ই সলামকে আঘাত করার জন্য তৃণমূলকে সংখ্যালঘু মানুষেরা মৌনীবাবা সেজে থাকবে না, তার প্রস্তুতি চলছে।

নদী বাঁধ মেরামতের টাকা তুলে নিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। তমলুকের সেচ ডিভিশনের জন্য বরাদ্দ অর্থ তুলে নিল রাজ্য সরকার। পূর্ব মেদিনীপুরের নদী ও বাঁধ মেরামতের কাজে তমলুকের সেচ ডিভিশনের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করে সরকার। ঠিক হয়, ওই টাকায় দাসপুর, নাটশাল, অমৃতবেড়িয়া, গঙ্গানারায়ণপুর, গেঁওখালি, কোলাঘাট এলাকার বাঁধের কাজ হবে। সেচ ডিভিশন কাজ শুরু করার জন্য টেন্ডারও ডাকে। কিন্তু কাজ শুরুর আগেই সম্প্রতি রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর বরাদ্দকৃত ৪ কোটি টাকা তুলে নেয়। সেচ দপ্তর কেন ওই টাকা তুলে নিয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি সেখ মাসুদ হোসেনকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভাপতির দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছর থেকে মোটা টাকা আসেনি। জেলায় বন্যার পর বারোচৌকো বাঁধ মেরামতের কাজে মাত্র ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা হাতে পায় জেলা পরিষদ। যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আয়লার পর সরকার যে ৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাও তুলে নেওয়া হয়। অথচ আয়লাতে এই বছর জেলায় নদী বাঁধে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। ফলে জেলা পরিষদের পক্ষে এখনই বাঁধের কাজে এগনো সম্ভব হচ্ছে না। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সেচ দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও তুলে নেওয়ার টাকার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও চিঠি জেলা পরিষদে আসেনি।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি এবং কংগ্রেস

অল্পদিনে ব্যাপক অর্থ কামাইয়া দুর্নীতির জালে জড়াইয়া নিজেকে কালিমালিপ্ত করিয়াছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়া। এক্ষেত্রে তিনি অখণ্ড বিহারে দুর্নীতির দায়ে জেলখাটা কীর্তিমান লালুপ্রসাদের কীর্তিকেও ম্লান করিয়া দিয়াছেন—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এহ বাহ্য। বাস্তবিকপক্ষে মধু কোড়া কাহাদের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও ছত্রছায়ায় এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার বিচার-বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরি। তাহার মস্তকোপরি সুশোভিত ছত্রটির নাম কংগ্রেস—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কৃষ্ণমেনন-জীপ কেলেংকারি হইতে আরম্ভ করিয়া মধু কোড়া ইস্তক দুর্নীতির ধারাবাহিকতা বোধকরি ভারতবর্ষে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঞ্চার অবর্তমান। অসম্ভবও বটে। কেননা যুগপৎ কেন্দ্র ও রাজ্যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার সৌভাগ্য অন্য কোনও দলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

মধু কোড়া কোনও দলের টিকিটে জিতিয়া ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন নাই। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (শিবু সোরেন), কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির তাবড় নেতাদের নেতৃত্বের দৌড়ে পিছনে ফেলিয়া জনপথবাসিনীর আশীর্বাদে এবং আনুকূল্যে উপরোক্ত দুইটি দলের সমর্থনেই তিনি গদীতে বসিয়াছিলেন। মধু কোড়া নির্দল বিধায়ক ছিলেন। তিনি আশীর্বাদ ধন্য হইয়া বিজেপি নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডাকে গদীচ্যুত করিয়া ইউ পি এ নেত্রীকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহাকে সর্বপ্রকার সমর্থন জুটাইয়া প্রকৃত সহায়তা করিয়াছিলেন দলতন্ত্রের প্রতিভূ রাজ্যপাল সৈয়দ সিবতে রাজি। যিনি রাজভবনকে একপ্রকার দলীয় কার্যালয়ে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁহার নামও দুর্নীতিতে জড়াইয়া যাওয়ায় কেন্দ্র সরকার তাঁহাকে প্রথমে অসমের রাজ্যপাল পদে নিযুক্তি এবং পরে ওই পদ হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার ও কংগ্রেস দলের মান বাঁচাইবার প্রয়াস করিয়াছে। ইহা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহলের নিকট অনবগত নহে। বাস্তবিক অর্থে, সিবতে রাজি রাঁচীর রাজ্যপাল ভবনকে তাঁহার আমলে কেবল রাজনীতির কেন্দ্র নহে, দুর্নীতিরও কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়াছিলেন।

মধু কোড়া কয়েক হাজার কোটি টাকা স্বনামে বেনামে কামাইয়া ঝাড়খণ্ডের সাধারণ দরিদ্র জনতার উন্নয়নের চাকাটা যে আটকাইয়া দিয়াছেন ইহাও বলা যাইতে পারে। কোনও দল বা সরকারের আয় সাধারণ মানুষের প্রদত্ত অনুদান অথবা রাজস্ব। অবশ্য কোটিপতি না হইলে কংগ্রেসে কৌলীন্য ও আনুকূল্য বজায় থাকে না। মমতা দেবীর মতো দু'একজন ব্যতিক্রম থাকিতে পারেন। স্মৃতি দুর্বল ভারতের জনতা-জনার্দনকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে সোনিয়ার মনোমত মনোমোহিনী মন্ত্রীসভার ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জনই কোটিপতি। রাজনীতিবিদ্‌রা গতর না খাটাইয়া কেবল বুলি বিতরণ করিয়া কীভাবে কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছেন তাহারও তদন্ত জাতীয় স্বার্থে হওয়া আবশ্যক।

মধু কোড়া শুধু টাকা কামাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সেই টাকার পরিমাণ আরও বাড়াইবার উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে লগ্নি করিয়াছেন। তাহার সংবাদ ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছে।

মধু কোড়ার দুর্নীতির দায় হইতে কংগ্রেস কখনই হাত সাফ করিতে পারে না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা হইতে অপসারিত করার জন্য কংগ্রেস মধু কোড়াকে ব্যবহার করিয়াছিল। মধু কোড়াও সেই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার দায়ভার কংগ্রেসকেও লইতে হইবে। দুর্নীতি ও কংগ্রেস সমার্থক। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মধু কোড়ার দুর্নীতি বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বক্তব্য উপস্থাপিত হয় নাই। যাহা হউক, নিকট ভবিষ্যতে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার নির্বাচনে প্রদেশবাসী তাহাদের বঞ্চিত করিবার জন্য প্রত্যুত্তর দিবার সুযোগ পাইতেছে। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া দুর্নীতি ধারক-বাহকদের ঝাড়খণ্ডছাড়া করিলে কিঞ্চিৎ সুফল ফলিলেও ফলিতে পারে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারত ইতিহাসের মূল স্বরূপ সন্ধান করলে অনেক আগেই ভারতসভ্যতার চরিত্র আবিষ্কার সম্ভব হত। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধের প্রথমেই লিখেছেন, "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়ে, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল। একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা যায় না। ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও কতকটা তাই। তবে তিনি হিন্দু ভারতবর্ষের সন্ধান করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর ইতিহাসের তাৎপর্য খুঁজেছেন।

—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের কমনওয়েলথ-সদস্য থাকা উচিত?

তরুণ বিজয়

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত যে ৫৩টি সদস্য দেশ রয়েছে, অতীতে এই দেশগুলিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিল। পরবর্তীতে বৃটেনের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধে দেশগুলি স্বাধীন হয়। যার মধ্যে মুখ্যভাবে রয়েছে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশের নাম। ভারতের পরেই রয়েছে মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বাংলাদেশ, বৃটেন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের মতো দেশ। সদস্য দেশগুলির মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৯০ কোটির কাছাকাছি। কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলির মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি রয়েছে ভারতে। তবুও শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কমনওয়েলথের সর্বোচ্চ পদাধিকারী তথা সভাপতি বৃটেনের মহারাণীই। যদিও কমনওয়েলথের সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনা করেন সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে এই দায়িত্বে রয়েছেন ভারতের কমলেশ শর্মা। একদা পরাধীন এই সমস্ত দেশগুলির কাছে আজও মহারাণীই সব, তিনিই প্রধান। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো--কমনওয়েলথ আয়োজিত গেমস-এর আনুষ্ঠানিক সূচনার জন্য এমন একটা গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি বৃটেনে গিয়ে মহারাণীর হাত থেকে ব্যাটন তুলে নিচ্ছেন যে দেশের শত শত বিপ্লবী বৃটেনের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে আত্মবলিদান দিয়েছেন। এই কাজ কি সেই মহান বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের প্রতি অবমাননা নয়? এটা গণতন্ত্রেরও অবমাননা নয় কি? বৃটিশ শাসকদের হাত ভারতীয় বিপ্লবীদের রক্তে রক্তাক্ত। আজ বৃটেনের সার্বিক সমৃদ্ধি তথা উন্নয়ণের পিছনে রয়েছে বৃটিশ শাসকদের ভারত থেকে লুঠ করা সম্পত্তির অংশ। বৃটিশ শাসকদের বর্বরতার ইতিহাসের অমানুষিক অধ্যায়ের সব থেকে বড় সাক্ষী---বাংলার মন্বন্তর, ১৮৫৭-র সংগ্রামের পর দেশভক্তদের নির্বিচারে গণহত্যা, ভারতীয় ভাষা, পরম্পরা ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে শুধুই ধ্বংস করা এবং সর্বোপরি তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে নেওয়া প্রভৃতি। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা, এমনকি যার জন্য ভারত ভাগ হয়েছিল। এসবই ভারতে বৃটিশ বর্বরতার এক-একটি উদাহরণ। এত বর্বরতার পরও বৃটেন কখনও ভারতবাসীর কাছে ক্ষমা চায়নি। অগণতান্ত্রিক বৃটেনকে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশের সম্মান প্রদর্শন, বৃটেনের মতো অগণতান্ত্রিক দেশের পরম্পরার ছায়ায় ৮০ আরব (এক আরব ঞ ৫০০০ কোটি) টাকা খরচ করে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করা কোন মানসিকতার পরিচয়?

কমনওয়েলথ গেমসকে আগে বৃটিশ এম্পায়ার গেমস্ বলা হতো। অর্থাৎ, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত পরাধীন দেশগুলির খেলা' বলা হতো। কমনওয়েলথ গেমস কি বৃটিশ কূটনৈতিক চাল, না কি বৃটিশ সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বৃটেন সেই পরাধীন দেশগুলিকে একমঞ্চে এককাট্টা করে শ্রম ও ধনের ভিত্তিতে মহারাণীকেই সর্বোচ্চ হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য করছে! পরিতাপের আরও বিষয় হলো, আজও ভারতের একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ রায়বাহাদুর, রায়সাহেব প্রভৃতি উপাধিতে গর্ব বোধ করেন। আমাদের এটা ঠিক করতে হবে, আমরা রায়বাহাদুরের পরম্পরার অনুগামী হয়ে জেনারেল ডায়ারের বংশধরদের নামে কপালে ফোঁটা লাগাব; নাকি ভগৎ সিং-এর পরম্পরার জন্য গর্ব করব? বৃটিশ মহারাণীর হাত থেকে কমনওয়েলথ গেমস-এর সূচনার পিছনে কমনওয়েলথের সদস্যদেশগুলির কোনও ঐতিহ্য সংযুক্ত নেই। কমনওয়েলথ গেমসের ওয়েবসাইট থেকে যা জানা যায়, তাতে কিছু মুখ্য বিন্দুর কথা বলা হয়েছে। যেমন, খেলার ব্যাটনের সূত্রপাত ২০০৮-এ বৃটিশ রাণীর শাসন ব্যবস্থার স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কমনওয়েলথ গেমসের খেলোয়াড়দের দ্বারা বৃটিশের রাণীর বাসস্থান বাকিংহাম প্যালেস থেকে ব্যাটন নিয়ে আয়োজক দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আজও বৃটিশ রাণীর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের কাছে শুভকামনা পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বৃটিশ সেনারা অংশ নেয়। বৃটিশ পরম্পরা বা রীতি মেনেই আজও ওই রীতি চালু রয়েছে।

সদস্য দেশগুলির দেশভক্ত নাগরিকরা বিভিন্ন সময়ে আপত্তি জানানোয় কিছু পরিবর্তন করা হয়। আসলে মূল ভাবনার মধ্যেই ত্রুটি রয়েছে। প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বের চিহ্ন বহনকারী সংগঠনের সদস্য হলাম কেন? কমনওয়েলথ গেমস-এর সদস্য ব্যতিরেকে কি ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নতি সম্ভব নয়? ভারতে কমনওয়েলথ গেমস দুর্নীতি ও লোক-হাঁসানো কাণ্ডে দাঁড়িয়েছে। এতে আমাদের না বাড়ে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান, না খেলার মান। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে কমনওয়েলথ গেমসের জন্য যে টাকা খরচ করে, তাতে ভারতের ৫৫টি জেলাতে অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি ও প্রতিভা বিকাশের জন্য ক্রীড়াকেন্দ্র ১০ বছর ধরে চালানো সম্ভব। আরও পরিতাপের বিষয় হলো পেরু, মালদ্বীপের মতো দেশের রাষ্ট্রপতি যেখানে বৃটেনের মহারাণী এলিজাবেথের বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ব্যাটন নিতে অস্বীকার করেছে, সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্যাটন নিতে পৌঁছে গেলেন!

একটা সময় ছিল যখন ভারত স্বাধীনতালাভের পর এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে অগ্রদূত ছিল। সেই সঙ্গে ভারতই স্বাধীন এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির একমাত্র ভরসা-কেন্দ্র ছিল। ভারতের সেই গুরুত্ব স্বাধীনতার সংগ্রাম, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য, পরম্পরার মাহাত্ম্য যা বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু

(এরপর ১৪ পাতায়)

বন্দেমাতরম-এ আপত্তি

সরকারি তোষণ-নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

নবকুমার ভট্টাচার্য

দেশের আকাশে আবার একটি দুর্যোগের ঘনঘটার প্রস্তুতি চলছে? এই আশঙ্কার কারণ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্‌কে কেন্দ্র করে আবার এক বিতর্কের সূচনা হয়েছে। কারণ উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দের মৌলবাদীরা বন্দেমাতরম্‌কে ইসলাম বিরোধী বলে ফতোয়া জারি করেছেন। তাঁদের দাবী জাতীয় সঙ্গীতের 'মাতরম্' শব্দটি নিষিদ্ধ করা হোক। কারণ এই শব্দটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী। দেওবন্দে জামাত-এ-উলেমা-এ হিন্দের জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের এই সঙ্গীত গাওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এবং মুসলিমদের কাছে টানতে এই অন্যায় প্রস্তাবের পরেও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। বন্দেমাতরম-এ আপত্তি যে জাতীয়তাবোধের অবমাননা করা তা একবারও মনে হয়নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কিন্তু রাষ্ট্রস্বীকৃত ও আইনানুমোদিত জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে সংশয় ও বিরুদ্ধতা করলে দেশ, রাষ্ট্র এবং খোদ সংবিধানেরই সমূহ বিপদ। জাতীয় সঙ্গীত সংসদে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে একটি আবশ্যকীয় সঙ্গীত তথা দেশবন্দনা। কোনও উৎকেন্দ্রিক ধর্মান্ধতা দিয়ে তা বিদায় করতে চাইলে তা দেশদ্রোহিতারই সামিল বলে গণ্য হবে। মনে রাখা উচিত ভারত একটি সেকুলার রাষ্ট্র এবং এই জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা করা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। সংবিধানের ৪২তম সংশোধন আইনে (১৯৭৬) নির্দেশিত (৫১ ক (ভাগ-৪-ক) আইনে বলা হয়েছে, যে মহান আদর্শ স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হৃদয়ে পোষণ করা ও অনুসরণ করা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব।

ভারতের মুসলমান মৌলবাদীরা 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত নিয়ে বর্তমানে যে অবাঞ্ছিত বিতর্ক সৃষ্টি করেছে তা তাদের ইতিহাস অজ্ঞতাবোধের পরিচায়ক। দেশবন্দনা তাদের ইসলামধর্ম-বিরুদ্ধ হলে হজরত মহম্মদের পৌত্র হুসেন মদিনা ত্যাগ করে কারবালা যাত্রার আগে মাতৃভূমি মদিনাকে স্যালুট করেছিলেন কেন? আর এই গানের বিরোধিতা করা বা এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন করার অর্থ ১৯৪৭ সাল বা তারও আগের দ্বিজাতিতত্ত্বের পথেই ফিরে যাওয়া। 'মাতরম্' শব্দে আপত্তির অর্থ এদেশের কমিউনিস্টদের মতো এদেশের মুসলিমরাও এদেশকে জননী বলে কোন দিনও ভাবতে পারেননি। মুসলমানের দৃষ্টিতে দেশ ভূমিখণ্ড মাত্র। জমির অধিকার পাওয়াই তাদের কাছে জরুরি। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া কতটা ইসলামপন্থী তা নিয়ে ইসলামের পণ্ডিতরা বিচার বিশ্লেষণ করতেই পারেন, সেটা ইসলাম বা মুসলমানদের নিজস্ব দ্বন্দ্ব। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরেও জাতীয় সঙ্গীতের জাতীয়তা নিয়ে যদি ফতোয়া জারি হয় তবে তার ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকতে হবে। শুধু ভোটের লোভে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সরকারি তোষণ নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আজ ফলতে আরম্ভ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে গীত দ্বিতীয় গানটিই বন্দে-মাতরম্। গেয়েছেন সন্ন্যাসী ভবানন্দ। পথ চলতে চলতে গৃহী কিন্তু গৃহচ্যুত মহেন্দ্রকে সন্ন্যাসী এই গানটি শুনিয়েছিলেন। গানের একটি স্তবক শুনেই মহেন্দ্র বুঝেছিলেন, এ হল দেশবন্দনার গান। তিনি সেকথা বলায়

(এরপর ১৪ পাতায়)

হিমাচলে বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সম্মেলন

শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ও নকশাল সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর এবং ১লা নভেম্বর হিমাচল প্রদেশের ঊনা-তে হয়ে গেল বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় সম্মেলন। সমগ্র দেশ থেকে প্রায় হাজার তিনেক কর্মী উপস্থিত ছিলেন ওই সম্মেলনে। সম্মেলনে আগামী বছরের জন্য সর্বভারতীয় সভাপতি মিলিন্দ বিদ্যার্থী পরিষদ। পরিষদের বক্তব্য এগুলি আসলে উচ্চশিক্ষাকে বাণিজ্যিকিকরণের দিকে ঠেলে দেবার ফিকির মাত্র। সম্মেলনে এ বিষয়ে সর্বসম্মতি ক্রমে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে সারা দেশে এখন প্রায় ১৮০টি ডীমড্ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং আরও ৩০০টির পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকাশ্য অধিবেশনের মঞ্চে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ।

মারাঠে ও সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু দত্ত শর্মা পুনর্নির্বাচিত হয়ে তাঁদের পদে বহাল রয়েছেন। বিদ্যার্থী পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ঊনা সম্মেলনে।

পরিষদের এই রাষ্ট্রীয় সম্মেলন থেকে শিক্ষার ব্যাবসায়ীকরণ, নকশাল সমস্যা ও সার্বিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করার নামে ডীমড্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারী প্রয়াসের তীব্র নিন্দা করেছে অখিল ভারতীয়

হিমাচলের মতো একটি ছোট রাজ্য যেখানে জেলার সংখ্যা মাত্র ১২টি এবং যার মধ্যে ২টো জনজাতি অধ্যুষিত জেলা প্রায় পাণ্ডব-বর্জিত;সেখানেও ব্যাঙের ছাতার মতো ১৪টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে এবং আগামীদিনে এরকম আরও গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

নকশাল সমস্যা নিয়ে বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি মিলিন্দ মারাঠে বলেন—"যে কোন রাজনৈতিক জটিলতার তুলনায় এই সমস্যাটি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আগামীদিনে আরও জটিল করে তুলবে। নকশাল হিংসা ঠেকাতে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।"

ওই কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পূর্বে হিমাচলের শহীদ নগরে ইন্দিরা স্টেডিয়ামে পরিষদের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত, এবছরই ষাট বর্ষে পদার্পণ করেছে বিদ্যার্থী পরিষদ। সেই উপলক্ষ্যে সারা দেশজুড়ে একগুচ্ছ সংগঠনিক কর্মসূচী নিয়েছে এই অখিল ভারতীয় ছাত্র সংগঠনটি।

বিএমএসের ধর্মঘটের ডাক

(১ পাতার পর)

বিগত ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চটকল শ্রমিকরা অন্ততপক্ষে ১০ বার ধর্মঘটে গেছে, মূলত পুরো বেতন, মহার্ঘ্য ভাতা, গ্রেড ও পে-স্কেল এবং ৯০ক্ষ স্থায়ী ও ২০ক্ষ বিশেষ বদলি প্রথা চালু করা, প্রভিডেন্ড ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, ই. এস. আই. প্রভৃতির দাবীতে।

অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে পাট শিল্পে অবসরপ্রাপ্ত প্রায় চল্লিশ হাজার কর্মী বিগত সময়ে গ্র্যাচুইটি পায়নি। অন্য কথায় চটকল মালিকরা অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের পাওনা প্রায় ৯০০ কোটি টাকা মেরে দিয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে।।

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের দাবী-দাওয়াগুলি উপেক্ষা করে মালিকদের সবরকম আবদার পূরণে ব্যস্ত। রাজ্য সরকার ২০০৭ সালে শিল্প বিরোধ স্কাচডড ট্রস্তব্ধৰ আইন সংশোধন করে আইনভঙ্গকারীদের শাস্তির কথা ও রিকভারী অফিসার পদ সৃষ্টির কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যে চালু ১৭টি শ্রম আইনের সব কটিই, মালিকরা যথেচ্ছ করে ভঙ্গ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় যতবারই ধর্মঘট হয়েছে কিছু দালাল ইউনিয়নের সহায়তায় প্রতিবারই সামান্য কিছু বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা দিয়ে অন্য সব কিছু "কমিটি" নামক কবরখানায় পাঠানো হয়েছে! ১৯৭৭ সাল থেকে এই ধরনের ১২টি "কমিটি" গঠিত হয়েছে যার নীটফল "শূন্য"।

অন্যদিকে, সরকারি, আধা-সরকারি এবং অন্যান্য বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থায় বেতন দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ হয়েছে। কিন্তু পাটকল শ্রমিকদের বেতন প্রতিদিন ৩০০.০০ টাকা থেকে কমে ৭০.০০ টাকা অথবা ১০০.০০ টাকা হয়েছে। ফলে পাট শিল্পের শ্রমিকরা পশুর মতো জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে।

বিগত কয়েক বৎসর ধরে খাদ্য পাকেজিং-এর জন্য প্ল্যাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় চট শিল্পে এর জন্য প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় চট শিল্পে প্রচুর বরাত আসছে, কিন্তু সরকারের মদতে মালিকরা শ্রমিকদের বঞ্চি ত করে তিন-চার গুণ লাভ করছে।

সুতরাং, বি. এম. এস. পাট শিল্পে মালিকের লেজুড়, রাজনৈতিক দলের অনুগত, দালাল ইউনিয়ন গুলির অপেক্ষায় না থেকে একতরফা লাগাতার ধর্মঘট-এ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। ভারতীয় মজদুর সঙেঘর রাজ্য সভাপতি প্রিয়ব্রত দত্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত তথ্য জানিয়েছেন।

মুসলিম তোষণ

(১ পাতার পর)

জোগাড়ের দায়িত্ব দিতে পারেন কিনা? এর সঙ্গে সঙ্গে এই রাষ্ট্রমন্ত্রীর যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আজ হলদিয়া বন্দর প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। কারণ নদীর নাব্যতা নেই। ফলে বড় বড় জাহাজের এই বন্দরে আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ড্রেজিং মেসিনের অভাবে সেই সময় তিনি নিজের রাজ্যের স্বার্থ উপেক্ষা করে দুটি ড্রেজিং মেসিন চেন্নাইতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আম-জনতা নাজেহাল

(১ পাতার পর)

দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আলুকে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

তাই এই শীতের মরশুমেও নতুন আলুতে হাত দিতে গেলে রীতিমতো ছ্যাঁকা খেতে হবে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, শীতকাল বলে আচমকা আলুর দাম কমলে মানুষের না আনন্দে হার্ট-অ্যাটাক হয়ে যায়। কয়লার দাম বাড়ায় এবার বিদ্যুতের বিল মেটাতে জান কয়লা হয়ে যাবে গৃহস্থের। কোল ইন্ডিয়ার বক্তব্য---কয়লার দাম প্রায় ১২ থেকে ১৫ শতাংশ বেড়েছে। যে কারণে ইলেকট্রিক বিলে ফুয়েল অ্যাডজাস্টমেন্ট চার্জ হিসেবে ইউনিট পিছু ৮ পয়সা বাড়বে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্র স্টেট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি পুরোপুরি কয়লা নির্ভর। তাই নতুন মহারাষ্ট্র সরকার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর বিদ্যুতের মাসুল বাড়িয়ে তাদের ভোটে জেতাবার জন্যে (?) রাজ্যবাসীকে পুরস্কৃত করেছে। মাদার ডেয়ারীও এই বছরে উপর্যুপরি বার তিনেক দাম বাড়াল দুধের। দাম বাড়ল পাউরুটিরও। বিশেষ করে পেট্রল-ডিজেলের দামও ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধমুখী হওয়ার দরুণ জিনিসপত্রের পরিবহন খরচও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

সব মিলিয়ে জিনিসপত্রের দাম কমার ন্যূনতম কোনও সম্ভাবনা এই মুহূর্তে অন্তত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এই প্রতিবেদনের সঙ্গে যে মূল্যবৃদ্ধির তালিকাটি দেওয়া হলো তাতে দেখা যাবে, গতবছর অর্থাৎ ২০০৮-এ জিনিসপত্রের যা দাম ছিল এবছরের জুনে তা বেশ ভালোরকম ভাবে বেড়ে গিয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে অগ্নিমূল্য। কিন্তু অক্টোবরে সেই অগ্নিমূল্য জিনিসপত্রেরই যা দরদাম হয়েছে তার সংজ্ঞা নিরুপিত করতে বাংলা অভিধান একেবারে ফেল করেছে। অগ্নিমূল্যের অগ্নিমূল্যকে আর কীই বা বলা যেতে পারে!

কেন্দ্র-রাজ্য নির্বিকার

(১ পাতার পর)

এবার অন্ধ্র ও কর্ণাটকে অতিবৃষ্টিতে ২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল বিনষ্ট হয়েছে।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। প্রাকৃতিক কারণে সারা দেশে শস্য উৎপাদন কম হতেই পারে। এটা নতুন ঘটনা নয়। অতীতে বহুবার এমন পরিস্থিতি হয়েছে। কিন্তু জিনিসপত্রের এমন আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি তেমনভাবে হয়নি যা এবার হয়েছে। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টিতে খরিফ মরশুমে এবার ফসল উৎপাদন মার খাবে এমন আগাম সতর্কবার্তা গত বছর থেকেই আবহবিদরা দিয়ে এসেছেন। কিন্তু মনমোহন সিং সরকার এই সতর্কবার্তায় কান দেয়নি। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে যতটা আগ্রহী ছিলেন ততটা ভারতের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নয়। এখন তিনি সংসদে বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করেছেন যে ভারতের ১০টি রাজ্যে খরার জন্য দুর্ভিক্ষ চলছে। কিন্তু এই স্বীকারোক্তিতে কী আসে যায়। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী কি করেছেন? কিছুই নয়। বরং প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির পর খাদ্যশস্যের কালোবাজারী বেড়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা ফয়দা তুলেছে। অথচ এন ডি এ সরকারের আমলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে বিপুল খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার দেশজোড়া গুদামে যে পরিমাণ চাল ও গম মজুত রাখা হয়েছিল তাতে সারা দেশের মানুষকে টানা চার পাঁচ মাস খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। সেই মজুত খাদ্য সম্ভার কোথায় গেল? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এফ সি আই-এর গুদামে এখন ৩০ মিলিয়ন টন চাল আছে। ভাল কথা। তবে সেই চাল বাজারে ছাড়া হচ্ছেনা কেন? সব কিছু বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা নেই যে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্রীয় সরকারের তেমন মাথাব্যথা নেই।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাশীল বামমোর্চা সরকারেরও তেমন হেলদোল নেই। একদা এই বামপন্থীরা মূল্যবৃদ্ধি রোধে দমদম দাওয়াইয়ের কথা বলতো। এখন বলে না। কারণ, অসাধু মজুতদার কালোবাজারীরাই সি পি এম তথা বামফ্রণ্টের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। বি পি এল তালিকাভুক্ত হত-দরিদ্র মানুষের জন্য বরাদ্দ চাল গম রেশন দোকানের অসাধু কমরেড মালিকরা প্রকাশ্যেই কালোবাজারে বিক্রি করছে। এর প্রতিবাদে অভুক্ত অসংগঠিত দরিদ্র মানুষ জেলায় জেলায় বিক্ষোভ বিদ্রোহ করেছেন। তবু বুদ্ধবাবুদের ঘুম ভাঙেনি। পুলিশকে ব্যবহার করে লাঠি গুলির দাপটে সেই বিদ্রোহকে দমন করেছে। রেশন দোকানের অসাধু কমরেড মালিকদের কোনও শাস্তি দেওয়া হয় নি। উল্টে সব দোষ কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে বাম রাজনীতির যাঁতাকলে রাজ্যের মানুষকে পিষে মারার ব্যবস্থা করেছে। এইভাবে মানুষের ক্ষোভকে চাপা দেওয়া যায় না। এই ক্ষোভের পথেই মাওবাদীদের প্রবেশ ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি অবহেলিত পিছিয়ে পড়া জেলায়। মানুষের পেটে ভাত থাকলে, উপার্জন থাকলে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থাকলে তারা কখনই কম্যুনিস্টদের পাতা ফাঁদে পা দেবে না। অত্যাচারিত ক্ষুধার্ত মানুষই রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মাওবাদীরা তাই সহজেই জঙ্গল মহলে জনসমর্থন পেয়েছে। তাদের মতবাদের জন্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী দফায় দফায় জেলা সফর করছেন। মাওবাদীদের পিটিয়ে রাজ্যছাড়া করার কথা বলছেন না। বুদ্ধবাবু মমতা কেউই দেওয়ালের লিখন পড়ছেন না। কেউই বলছেন না যে সব কাজ সব রাজনীতি এখন বন্ধ থাকুক। এখন একমাত্র কাজ মূল্যবৃদ্ধি রোধ। মানুষই যদি না বাঁচে তবে তাঁরা কাদের নিয়ে রাজনীতি করবেন?

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্য সিপিএম নেতারাই পার্টির মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাচ্ছেন

নিশাকর সোম

রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে আসার ব্যাপারে মমতা এবং সিপিএম নেতৃত্ব একমত। মমতা সরবে দাবী করেছেন যাতে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় কেরলে প্রথম নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মন্নাথ পদ্মনাভন-এর নেতৃত্বে নায়ার সার্ভিস সোসাইটির আন্দোলনে বিপর্যস্ত নাম্বুদ্রিপাদ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেছিলেন। শোনা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ৩৫৬ ধারার সুপারিশ তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দু'বার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সংবিধান অনুযায়ী তৃতীয়বার তিনি অনুমোদন করেছিলেন।

এ রাজ্যের সিপিএম-এর ছকটা হল---কিছু নতুন কাজ দেখানো---প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের মতো চাকরির লোভ দেখানো। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির জন্য ৫০ লক্ষ ফর্ম বিলি হয়েছে। কতজন পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে এই প্রশ্নের উত্তরে সিপিএম-এর বকলমা নেওয়া দৈনিকের চাকরির পাতায় লেখা হয়েছে---একমাত্র জ্যোতিষীরাই বলতে পারেন কতজন পরীক্ষার বসার সুযোগ পাবে। এতো সেই ঘোড়ার মুখে গাজর ঝুলিয়ে দৌড় করানো। সিপিএম ঠিক করেছে---তৃণমূল অধিকৃত গ্রামগুলিকে "মুক্ত" করবে। তার জন্য বাহিনী তৈরি হচ্ছে এবং হবে। আর বিরোধী নেত্রী সম্পর্কে আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখতে হবে।

ফলে যদি বিরোধী নেত্রী---কিছু উলটোপালটা কাজ করে বসেন তার ফায়দা তোলা। এ-সম্পর্কে হাওড়ায় পার্টি কর্মীদের একসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য বলেছেন, "পার্টি এবং সরকারকে নতুনরূপে কাজে নামতে হবে।"

এ প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে আর কেউ বর্তমান অবস্থার দায়ভার গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। বিনয় কোঙার শুধু শারীরিকভাবে অসুস্থ তাই নয়, তাঁর পুত্রকে পুলিশ নাকি গ্রেপ্তার করে ভীষণভাবে প্রহার

> **উপনির্বাচন উপলক্ষে জ্যোতি বসুর নামে কংগ্রেসিদের কাছে ভোট ভিক্ষা করে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে!! একদিকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের ওপর সমর্থন প্রত্যাহার অপরদিকে সেই কর্মী সমর্থকদের কাছে ভোটভিক্ষা।**

করেছে। কারণ তিনি নাকি অন্যের পুকুরের মাছ তুলিয়ে ছিলেন এবং পুকুরের মালিকের প্রতিবাদে তাঁকে পিটিয়ে ছিলেন। গৌতম দেব অসুস্থ। তিনি কোনও ভারি কাজ করতে পারবেন না। বিনয় কোঙারের অনুপস্থিতিতে মদন ঘোষ কৃষক ফ্রন্ট, পি আর পি তথা জনস্বাস্থ্য দেখছেন। শ্যামল চক্রবর্তী আক্রমণের মুখপাত্র হয়েছেন। এমতাবস্থায় আগামী নির্বাচন পর্যন্ত বুদ্ধদেববাবুকেই প্রধান দায়িত্ব সামলাতে হবে। রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের মনোভাব হল ২০১১-তে হার যখন হবেই, তখন তাঁর দায়িত্ব বুদ্ধ দেবকেই বহন করতে হবে। কারণ তাঁর কার্যকলাপের ফলেই এ রাজ্যের পার্টির আজ এই দুর্গতি।

বিমান বসু শতচেষ্টা করেও পার্টির বৃহৎ অংশকে সক্রিয় করতে সক্ষম হননি। কারণ পার্টি কর্মীদের বড় অংশ বসে গেছেন। কোনও উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। এর কারণ হলো তাঁরা তো নির্বাচনে জিতে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে দাদাগিরি করে বাড়ি গাড়ি বিষয়বৈভব করার ধান্ধা নিয়েই চলতে চেয়েছিলেন। অবশ্য নীচের তলার কর্মীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, ওপর তলার দাদারাও তো এই পথের পথিক। মনোভাব হল লুটে নে দু'দিন বইতো নয়। সাধারণ মানুষও পার্টির প্রতি বীতশ্রদ্ধ---। তরি-তরকারি, মাছ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য আকাশ ছোঁয়া। সে-সম্পর্কে সরকার ও পার্টি কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সরকারের প্রতিটি অফিসে অধিকাংশ কর্মচারী কিছুই কাজ করে না---কিছু বলতে জবাব দেন---'রাখুন মশাই, লোকের কাজ করে কি হবে? ভোট দেবে বিরুদ্ধে।'

যে-কথা আগেই এই কলামে লেখা হয়েছিল যে, দুই যুযুধান গোষ্ঠী একে অপরে পার্টি অফিস জ্বালানো, নেত্রী-নেতাকে অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ, সিপিএম পার্টি নেতা বিজয় মোদকের মূর্তি ভাঙা (বিজয়বাবু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন)। এই দুই গোষ্ঠী রাজ্যকে সিভিল-ওয়ার-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি সিপিএম দলের দু'টি কাজের ফলে পার্টির মর্যাদা আরও নষ্ট হয়েছে। প্রথমত, উপনির্বাচন উপলক্ষে জ্যোতি বসুর নামে কংগ্রেসিদের কাছে ভোট ভিক্ষা করে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে!! একদিকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের ওপর সমর্থন প্রত্যাহার অপরদিকে সেই কর্মী সমর্থকদের কাছে ভোটভিক্ষা। এ-ব্যাপারে বামফ্রন্টের সিপিএম ছাড়া আর সব দলই জ্যোতি বসুর নামের এই বিবৃতি সমর্থন জানায়নি। জ্যোতি বসুর বিবৃতি সত্ত্বেও দশটি সিটে বামফ্রন্ট হারতে পারে এর ফলে জ্যোতি মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। মৃত্যুর পূর্বে এই প্রধান নেতাকে হেনস্থা করার কি খুব দরকার

> **আসলে সিপিএম পার্টিটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করার দায়িত্ব নেতারাই নিয়েছেন। তাঁরা সুপারি কিলার-এর ভূমিকা নিয়েছেন। নেতাদের ওপর কর্মীদের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।**

ছিল? আদতে রাজ্য সিপিএম-এর নেতারা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছেন। পরাজিত যখন হবেই সব পুড়িয়ে খাক করে দাও। দ্বিতীয় আর একটা গালে চুনকালি ফেলার ঘটনা ঘটালেন সিপিএম নেতারা। হুগলির পুরসভার বড়দিগরুই গ্রামের বৃদ্ধা সইফুন্নেসার মৃত্যুকে এস এস কে এম-এর মেডিকাল সুপার স্বাভাবিক মৃত্যু বলেছিলেন। মৃতার ডাক্তারও ডায়াবেটিস -জনিত মৃত্যু বলে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। ময়না তদন্তের রিপোর্টেও সিপিএম নেতাদের মুখ পুড়ল। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন---"ডায়াবেটিস ফুট" জনিত কারণে শরীরের সেপ্টিসেমিয়া হয়ে রেন্যাল ফেলিওর হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্য-সিপিএম দলের এই আচরণের নিন্দা করা উচিত। ধন্য শ্যামল চক্রবর্তী! ইনি তো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্যসভার সদস্য! এই ঘটনার ফলে সিপিএম-এর প্রতি সাধারণ মানুষের তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হবে। আসলে সিপিএম পার্টিটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করার দায়িত্ব নেতারাই নিয়েছেন। তাঁরা সুপারি কিলার-এর ভূমিকা নিয়েছেন। নেতাদের ওপর কর্মীদের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

এদিকে ২০১০-এ কলকাতা পুরসভার নির্বাচন নিয়ে কলকাতা জেলা নেতৃত্ব আলোচনা করছেন, কলকাতার বর্তমান অধিকাংশ কাউন্সিলার আর প্রার্থী হতে চান না। এর মধ্যে মেয়র পরিষদের প্রায় সদস্যই আছেন। কলকাতা পার্টি প্রার্থী হাতড়ে বেরাচ্ছেন।

পার্টির নেতারা চান রাষ্ট্রপতি শাসন হলে শহীদ হয়ে ভোট ভিক্ষা করবেন, কিন্তু তাঁরা কি জানেন, আজ যে পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের দিকে আছে তারাই সিপিএম-কে পিটিয়ে জেলে পুরে, শেষ করে দেবে। মনে করুন শেষের সেদিন কিনা ভয়ঙ্কর।

মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, "এরা রাষ্ট্রপতি শাসনে ক্ষমতায় এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি শাসনে ক্ষমতা থেকে দূর হবে।"

অবশ্যই, বিমান বসু এ কথার বিরোধিতা করেছেন। ঘটনা দ্রুত এগোচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর হচ্ছে।

অন্য রকম

পাগলধরা

ভালো কাজের জন্য আর পাঁচজন তাঁকে পাগল বললেও, তিনি তাতে কান দেন না। মোসলেম মুন্সীর অভিধানে পাগল শব্দের কোনও ঠাঁই নেই। তিনি নিজেও বিশ্বাস করেন না মানুষ কখনও পাগল হতে পারে। মুন্সীর মতে, কেউ মানসিক ভারসাম্য হারালেও তাকে পাগল বলা উচিত নয়। জীবনে তো রোগ-ভোগ হতেই পারে। তাই বলে পাগল সাজিয়ে তাকে আলাদা সমাজে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়। রাস্তা-ঘাটে কাউকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে তিনি মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। তাকে সুস্থ করার জন্য মাঠে নেমে পড়েন মোসলেম মুন্সী। রোগীকে সুস্থ করে জীবনের মূল ধারায় ফিরিয়ে দেন তিনি। এতেই মানসিক পরিতৃপ্তি মেলে তাঁর।

রাস্তা থেকে এক পাগলকে পাকড়াও করছেন শ্রীমুন্সী।

মাঝবয়সী মোসলেম মুন্সী ইতিউতি মানসিক রোগী দেখতে পেলেই নিজের ঘরে তুলে নিয়ে যান, চিকিৎসা করান। তাকে খাওয়ানো-দাওয়ানো থেকে সমস্ত কিছু নিজের হাতে করান তিনি। বাড়িতে রোগী রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থাও মুন্সী নিজেই করেন। পরিবারকে একাজে টানেন না। প্রথম প্রথম বাড়ির লোক আপত্তি জানিয়েছিল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা মেনে নিতে পারেনি একাজ। মুন্সীই তাদের রাজি করিয়েছেন। তারপর থেকে অবশ্য আর কোনও বাধা আসে না। তাদেরও গা-সওয়া হয়ে গেছে মানসিক রোগীদের সঙ্গে। মুন্সীর গৃহ শুধু তাঁর নিজের নয়, মানসিক রোগীদের আশ্রয়স্থল। এ যেন মানসিক রোগীদের নিজের আশ্রম।

পাগল ধরার জন্য মুন্সী প্রতিদিন বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে কোন জাতের এসব বিচার না করেই, ধরে আনেন তাদের। চিকিৎসায় সুস্থ হলে, আবার তাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেন। শুধু বাংলা নয়, বাংলার বাইরে থেকেও পাগল ধরে আনেন মুন্সীবাবু। মুন্সীবাবুর মতে, তাঁর নিজের ঘর কলকাতায় হলেও, যেখানেই ভবঘুরে আছে, মানসিক রোগী আছে, সেটাই তাঁর ঘর, তাঁর সংসার। খরচ জোগান কিভাবে? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, সমাজসেবী তাদের অনুদানে দিব্যি জুটে যায় ওষুধের খরচ। নিজের রোজগারের টাকাও খরচ করেন মুন্সীবাবু। যাতে আইনি জটিলতা তৈরি না হয়, তার জন্য থানায় মানসিক রোগীদের সমস্ত খবরা-খবর আগাম জানিয়ে আসেন।

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা

মালদহে অভূতপূর্ব উন্মাদনা ও উৎসাহ

তরুণকুমার পণ্ডিত : মালদা ।। বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রাকে কেন্দ্র করে মালদা জেলা জুড়ে গ্রামে গ্রামে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সে উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাস দেখা গেল তা শুধু গো-মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ নয়, এখনও ভারতের আত্মা যে গোরু ও গ্রাম---তাই এথেকে প্রমাণিত হল।

গত ২৪ অক্টোবর মালদা জেলার তিনটি স্থান থেকে তিনটি উপযাত্রা বের হয়েছিল গো-আধারিত গ্রাম বিকাশের মাধ্যমে স্বাবলম্বী ভারত নির্মাণের বার্তা নিয়ে। একটি যাত্রা কালিয়াচক ব্লকের আকন্দবাড়িয়া অঞ্চলের গয়েশ্বরী স্কুল থেকে, একটি পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া থেকে এবং অপরটি চাঁচল মহকুমার কলিগ্রাম থেকে বের হয়ে ৯ দিনে মোট ১৬০০ কিমি অতিক্রম করে জেলার ১৩০০ গ্রামের মধ্যে দিয়ে ১২ লক্ষ গ্রামের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এক নজির সৃষ্টি করে। গ্রামের প্রতিটি স্থানে রথে রাখা গো-মাতার মূর্তি দর্শন ও পূজন করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। তিনটি যাত্রার প্রতিটিতে ২২ জন করে কার্যকর্তা ৯ দিনে ১০০টির ওপরে বড় সভা এবং ৩০০-এর ওপরে ছোট সভাতে গোরুর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই গো-গ্রাম যাত্রায় গ্রামের মানুষ ৬০০টি স্থানে সঙ্কল্পবাক্য পাঠের মধ্যে দিয়ে গোরু ও গ্রামকে রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করেন। সারা জেলায় ২২টি স্থানে সুসজ্জিত দেশীয় গো-মাতা, বলদ প্রদর্শনী ও পুরস্কারের আয়োজন করে। গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে এই গো-প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিল। গো-গ্রাম যাত্রার শুরুতে উদ্যোক্তারা ভাবতে পারেননি গোরুকে নিয়ে গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে এই স্বতস্ফূর্ত সাড়া ও আলোড়েন ছড়িয়ে পড়বে। সকলের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গো-গ্রাম যাত্রার সুসজ্জিত ট্যাবলো দেখার জন্য ও পূজন করার জন্য মানুষের ঢল নেমেছিল মালদা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে। প্রথমে ঠিক ছিল খৃস্টান অধ্যুষিত গ্রামগুলির ভিতরে না ঢুকে শুধুমাত্র ছুঁয়ে যাবে কিন্তু মানুষ রাস্তা আটকে যাত্রাকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে গেছেন। দুর্বা এবং আতপ চাউল নিয়ে গো-মাতার প্রতিকৃতিতে পুজো করেছে। তাদের প্রশ্ন, কেন আগে থেকে খবর দেওয়া হয় নি। পুরাতন মালদা ব্লকের বলদাহারা, কোচপাড়া প্রভৃতি খৃস্টান অধ্যুষিত গ্রামের হাজার হাজার মহিলারা এইভাবে হিন্দু পরম্পরা মেনে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে পূজো করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। গো-গ্রাম যাত্রা পথে, গ্রামের সহজ সরল মানুষেরা যে ভাবে আগ্রহসহকারে গোরুকে তেল সিঁদুর মাখিয়ে গলায় মালা পরিয়ে ফুল দুর্বা দিয়ে প্রায় ৬০০টি স্থানে পূজনের ব্যবস্থা করল—তাতে দেশী গোরুর মধ্যে যে ৩৩কোটি দেবতার অবস্থান রয়েছে এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটল। পুরাতন মালাদার পোপড়া ও বটতলী গ্রামে ১৫টি গোরুকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল এবং প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। যে গোরুটি প্রথম স্থান পেয়েছিল সেটিকে সোনার অলঙ্কার দিয়ে সাজানো হয়েছিল, মাথার মুকুট ও গলার সোনার কণ্ঠহার পরিয়ে---সুসজ্জিত সেই গোরুটিকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল।

মালদহের পোপড়ায় গো-পূজন।

৯ দিনের যাত্রাপথে গ্রামের মানুষরাই যাত্রা সঙ্গী কার্যকর্তাদের জল খাবার ও ভোজনের ব্যবস্থা করেন। ৯টি বাহনের তিনটি মাইকে রথের আগমনবার্তা ঘোষণা করতেই গ্রামের মানুষ ছুটে এসেছে হ্যান্ডবিল নিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে দেওয়া পত্রকে স্বাক্ষর করেছেন। গো-গ্রাম বিকাশের বিভিন্ন সাহায্য পত্রিকাও মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করেছেন। গো-মূত্র ও গোবর থেকে তৈরি সাবান, ধূপ ও ওষুধ ক্রয় করেছেন সারা মালদা জেলা জুড়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আদর্শকে ভুল প্রমাণিত করে কোনও স্থান থেকেই এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কোনও বাধা বা প্রতিরোধ আসে নি।

১ নভেম্বর মূল যাত্রা মালদাতে প্রবেশ করলে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য যে ভাবে ঢাকের বাজনা ও মোটর বাইক র‍্যালির মাধ্যমে স্বতস্ফূর্ত মানুষের ঢল নেমেছিল তা ছিল দেখার মতো। গায়ত্রী পরিবার এবং পতঞ্জলি যোগপীঠের সদস্যদের মাধ্যমে বিশ্বমঙ্গল শান্তি যজ্ঞে মানুষ আগ্রহ সহকারে আহুতি দেয় এবং গো-মূত্র ও গোবর থেকে তৈরি সামগ্রী কেনার জন্য দর্শকের মধ্যে হুটোপুটি লেগে যায়। সব মিলিয়ে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী মনে করিয়ে দেয়--- ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ওই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন---এদেশে চিরকাল।

অসমে হাজার হাজার ডি-ভোটার বকেয়া মামলা ঝুলে রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অসমে কমবেশি একলক্ষ ৯১ হাজার পাঁচশত সাতান্নটি 'ডি' ভোটার সম্পর্কিত মামলা বিভিন্ন ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ঝুলে রয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এর মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ভারতীয়। আবার যে সকল বিদেশি বা বহিরাগত এইসব কেসে জড়িত, তারা মামলা ঝুলে থাকায় বহাল তবিয়তে রাজ্যে বসবাস করছে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে প্রায় দু'লক্ষের কাছাকাছি উপরিউক্ত মামলা বাদেও লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিকদের মামলা লটকে আছে। তারাও বহাল তবিয়তে।

আটের দশকে অসম আন্দোলন-এর পর (আসু বা অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ডাকে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন) ভারতের নির্বাচন কমিশন অসমের ভোটার তালিকা সংশোধন করে। তখনই নাগরিকদের এটা বড় অংশকে 'ডি' বা ডাউটফুল ভোটার বলে চিহ্নিত করে। 'ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল' গঠিত হয়েছিল 'ডি' ভোটারদের মামলা নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যেই। এতবছর বাদেও ১,৯১,৫৫৭টি মামলা বকেয়া পড়ে রয়েছে। এবছর ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে আলোচনায় বসে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চাপ দেন। কিন্তু এখনও অবধি তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বিভিন্ন জেলা অনুসারে বাকেয়া কমবেশি 'ডি' ভোটার মামলা।

শোণিতপুর---৩১,০৩৮, বরপেটা---২৯,৮৬৯, ধুবড়ি---২৫,৬৪১, গোয়ালপাড়া---৯,৯৬৮, কোকরাঝাড়---৭৫২, কামরূপ---১,১৭০, দরং---১৪,৩২৯, লখিমপুর---৪,৪০০, ডিব্রুগড়---২৬৮, জোড়হাট---৮, নগাঁও---২০,৯২৬, কার্বিআংলং---২৩৩, কাছাড়---১২,৬২৬, করিমগঞ্জ---৬,৪৩১, গোলাঘাট---১,৭২৭, বনগাঁইগাঁও---১২৭, মরিগাঁও---২,৪৪৭, ঢেমাজি---৭,৪৩০, তিনসুকিয়া---১,০৩৬, চিরং---২৭৯ এবং উদালগুড়িতে---১৩,০৫১টি।

প্রসঙ্গত, এই সন্দেহজনক ভোটাররা লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে যথারীতি ভোট দেন। শুধু তাদের নামের পাশে 'ডি' লেখা থাকে। কাছাড় জেলার শিলচর আদালতের এক আইনজীবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম (২০০৩সালে) ব্যাপারটা কি? উনি বলেছিলেন, বরাক ভ্যালির ২০ হাজার মামলার বেশিরভাগটাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে। আর মুসলমানদের তাদের পদবী আর পূর্বপুরুষের নামধাম কেউ জানেনা। তারা স্বীয় সম্প্রদায়ের যে-কোনও লোকের কাছ থেকে রক্তসম্পর্কিত এফিডেভিট এনে আদালতে হাজির করে। দ্রুত ভারতীয় হয়ে যায়। হিন্দুরা এসকল ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। ফলে তাদের মামলা ঝুলতে থাকে। একবার বিদেশী চিহ্নিত হলেই অসম চুক্তি অনুসারে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ-এর পরে যে-সকল হিন্দু বাংলাদেশে টিকতে না পেরে জাত-ধর্ম বাঁচাতে এদেশে এসেছেন; তাদের আবার হিংস্র বাঘের খাঁচায় যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা উপলক্ষে ইসলামপুরে জনসমাবেশের একাংশ।

কৃষিতে জৈবসার প্রয়োগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা নাগাল্যাণ্ডের

সংবাদদাতা।। কৃষিতে জৈবসারের ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্যে বেঙ্গালুরুর ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটেন্স সেন্টার ফর অর্গানিক এগ্রিকালচারের সঙ্গে একটি সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেছে নাগাল্যাণ্ড সরকার।

গত আগস্টে এবিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। তারপরই ব্যাপক সমীক্ষার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি স্থানীয় স্টেট অ্যাকাডেমি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্গানিক ক্লাস্টার প্রজেক্ট, ফার্মারস ক্লাস্টার এবং ট্রেনিং অ্যাণ্ড সার্টিফিকেশন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী ডঃ সি মুরি। প্রাথমিক ভাবে ২৫০ হেক্টর জমিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধার

সংবাদদাতা।। কোহিমায় 'পুলিশ' লেখা একটি বোলেরো গাড়ি থেকে চারশ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে কোহিমা পুলিশ। এমনকি গাড়ির চালকও পুলিশের খাঁকি পোষাকপরা ছিল। তাই বি এস এফ চেকপোস্টে গাড়ি আটকানোর কথা ভাবেনি কর্মীরা। কিন্তু সন্দেহজনক এই বোলেরো গাড়িকে ধাওয়া করে পুলিশের ক্যুইক রেসপন্স টিম-এর জীপ। বেশ কিছুক্ষণ দুটি গাড়ির মধ্যে চলে গতির লড়াই। শেষে বাধ্য হয়ে পুলিশ বোলেরো লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গাড়ির সামনের চাকায় গুলি লাগার পরও গাড়িটি থামানো হয়নি। শেষপর্যন্ত লোয়ার বাইপাস পার হয়ে ৩৯নং জাতীয় সড়কে গিয়ে গাড়িটি রেখে চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ গাড়ি থেকে ২৫ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে। এতে প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম গাঁজা ছিল।

গাড়ির চালক কোন জঙ্গীগোষ্ঠীর সদস্য বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে।

দক্ষিণ ভারতে মাও-সিমিকে একসূত্রে গাঁথছে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চীনকে নিয়ে আরও একটি উদ্বেগজনক এবং চাঞ্চ ল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছেন এদেশের গোয়েন্দারা। গোপন সূত্রে তাঁরা জানতে পেরেছেন, ভারতের মাওবাদীদের সঙ্গে নিষিদ্ধ মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন 'স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া' (সিমি)-র আঁতাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে চীন। সম্প্রতি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজারে'র প্রতিনিধিকে দেওয়া একটি বক্তব্যে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই চাঞ্চ ল্যকর তথ্যটি জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে ওই দুই সংগঠনের কিছু মাঝারি স্তরের নেতা বৈঠকে বসেন। একজন বিদেশী গোয়েন্দা এবং কেরল কেন্দ্রিক প্রাক্তন সুপরিচিত এক নকশাল নেতাকে দক্ষিণ ভারতে দেশবিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ দেখভাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে ওই গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবী। এর প্রেক্ষিতে এটাই মনে করা হচ্ছে, ওই বিদেশী গুপ্তচর এবং নকশাল নেতার উদ্যোগেই মিলিত হচ্ছে এদেশের মাওবাদী এবং সিমি ক্যাডাররা।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, যদিও চীনের কোনও সংগঠন এখনও পর্যন্ত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু পাকিস্তানের গোয়েন্দা বাহিনীর কয়েকটি সূত্রকে কাজে লাগিয়ে তারা ক্যামোফ্লেজ করছে। এবিষয়ে গোয়েন্দাবাহিনীর হাতে নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণাদিও রয়েছে। গোয়েন্দা আধিকারিকদের মতে, দক্ষিণ ভারতে অনুপ্রবেশ করতে চীন ইতিমধ্যেই একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে। এবং তাদের কাজে মদত যোগাতে বেশ কিছু বামমার্গী বুদ্ধিজীবীরও সহায়তা নিচ্ছে তারা। চীন চেষ্টা করছে আস্তে আস্তে দক্ষিণ ভারতের পুরো বুদ্ধিজীবী মহলটাকেই দখল করে নেবার।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি দক্ষিণ ভারতে ইসলামিক মৌলবাদী এবং মাওবাদী গোষ্ঠী জোট বাঁধে তবে সেক্ষেত্রে তাদের যে সম্মিলিত শক্তির সৃষ্টি হবে তা ওখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পুরো বারোটা বাজিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এসব বিবেচনা করেই চীন একাজে অগ্রসর হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। অন্যদিকে গোয়েন্দা বাহিনীর কড়া নজরে রয়েছে প্রাক্তন সিমি প্রধান সফদার নাগোরি। মধ্যপ্রদেশ পুলিশের জেরায় নাগরী স্বীকার করেছেন, তাঁদের ২০০ সদস্যের আত্মঘাতী বাহিনী রয়েছে এবং যে স্থানে এই বাহিনীর অবস্থান, সেটির দূরত্ব কেরল থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার।

আসলে কেরলে সি পি এম পার্টির ভেতরে মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন এবং পিনারাই বিজয়নের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে তাতে ওখানকার বুদ্ধিজীবীরা পার্টি থেকে তো বটেই, মুখ ফেরাচ্ছিলেন বামপন্থার আদর্শ থেকেও। এই সুযোগটারই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে মাওবাদীরা। নতুন বোতলে সেই কমিউনিজম নামক মাদক ভরেই বামপন্থাকে বাজারজাত করছে তারা। সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু দলিত আন্দোলনও পোয়াবারো করে দিয়েছে মাওবাদীদের।

সম্প্রতি প্রাতঃকালীন ভ্রমণে বেরনো এক ভদ্রলোকের নৃশংস হত্যার রহস্য ইতিমধ্যেই উদ্ঘাটন করে ফেলেছে কেরলের রাজ্য পুলিশ। এই হত্যার পেছনে পুলিশ একটি দলিত সংগঠন 'দলিত মানবাধিকার ফোরামে'র হাত দেখছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, এই সংগঠনটি আলুভা বলে কেরলের একটি জায়গায় বছর দুয়েক আগে তৈরি হয়। তারপর যা হয়। সংগঠনটি কেরলের বিভিন্ন গ্রামের একেবারে মহল্লায় মহল্লায় পৌঁছে যায় এবং দলিতদের উন্নতিকল্পে কোটি কোটি টাকা তাদের তহবিলে ঢোকায়।

গোয়েন্দা বাহিনীর এই চাঞ্চ ল্যকর রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে জমা পড়ার আগে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মন্তব্য করেছিলেন, কেরলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যোগ দেওয়া কেরলিয়ান তরুণদের সংখ্যাটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এতে মদত যোগাচ্ছে কয়েকটি মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল। গোয়েন্দা বাহিনীর সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, কেরলের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে সন্ত্রাসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের সংখ্যাটা প্রকৃত অর্থেই মাত্রাতিরিক্ত এবং রাজ্য পুলিশ এব্যাপারে পুরোপুরি নির্লিপ্ত। গোয়েন্দা ব্যুরোর আশঙ্কা, সম্প্রতি যে চার কেরলবাসী সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে কাশ্মীরে, তার প্রতিশোধ নিতে কেরলের কোন জনবহুল এলাকা সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করতে পারে অচিরেই।

বৈদিক কাণ্ডের ছায়া ওড়িশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বৈদিক ভিলেজ কাণ্ডের ছায়া এবার ওড়িশায়। ভয়ংকর জমি কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে গেল ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক সরকার। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের জমি বেদান্ত ফাউণ্ডেশন-কে দিয়ে দেবার। এই বেদান্ত ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক কেলেংকারীর অভিযোগ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে জমি নেওয়ার ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে প্রতারণা করার মতো অভিযোগ উঠেছে। একই সাথে দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য বিদেশী চার্চের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অনুদান ওই বেদান্ত ফাউণ্ডেশন পাচ্ছে বলে সরাসরি লিখেছে ইংল্যাণ্ডের 'দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' পত্রিকা। সংবাদসংস্থার খবর, মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক বিশ্ববন্দিত জগন্নাথ মন্দিরের এবং সেইসঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের মোট ৬০০০ একর জমি বেচে দিয়েছেন বেদান্ত ফাউণ্ডেশনের অনিল আগরওয়ালকে। এই অনিল আগরওয়াল বেদান্ত অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টেরলাইট ইনডাস্ট্রিজেরও মালিক। তাঁর বিরুদ্ধেই মুখ্যত রাজ্য সরকারকে প্রতারণা করবার অভিযোগ উঠেছে।

২০০৬ সাল নাগাদ ওড়িশা সরকার এই জমি নিয়ে বেদান্ত ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে মউ চুক্তি-স্বাক্ষর করে। কিন্তু এর-পরেই সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে বেদান্ত ফাউণ্ডেশনের নাম বদলে অনিল

আগরওয়াল ফাউণ্ডেশন হয়ে যায়। ২০০৬-এর ১৯শে জুলাই মউ সাক্ষরের দিন দেখানো হয়েছিল অনিল আগরওয়ালের বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ আগরওয়াল ওই বেদান্ত ফাউণ্ডেশনের একজন ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ওই বছরেরই ২রা এপ্রিল লক্ষ্মীনারায়ণ আগরওয়াল মারা যান। এবং তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটও উত্তর-প্রদেশ সরকার ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং বেদান্ত ফাউণ্ডেশনের নাম পাল্টানোর কাজটা মউ চুক্তি সাক্ষরের সময়েই একপ্রকার পাকা করে ফেলা হয়েছিল। যে কারণে কয়েকটি ভুয়ো নথিপত্র তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল যে ফাউণ্ডেশনটি একটি পাবলিক (জনগণের) কোম্পানী, অর্থাৎ এর কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা নেই বরং অছি পর্ষদের দ্বারাই এটি পরিচালিত হয়।

তবে এক্ষেত্রে অমার্জনীয় অপরাধটি করেছে কিন্তু ওড়িশা সরকার। ভারত সরকারের কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রকের রিজিওনাল ডিরেক্টরের পক্ষ থেকে কোনও চিঠি আসার আগেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বেদান্ত ফাউণ্ডেশনকে অনুমোদনপত্র দিয়ে দেওয়া হয়। যে অনুমোদন পত্রের জেরে জমি নেওয়া শুরু হয়ে যায় এবং সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ২০০৬ সালে মউ সাক্ষরিত হয়, ২০০৮ নাগাদ মউ চুক্তির জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এবছরই আচমকা তড়িঘড়ি ওড়িশা বিধানসভায় বিশেষ 'বেদান্ত বিল' পাশ করা হয়। এই বিল তখনই পাশ করা হলো যখন বেদান্তের মালিক অনিল আগরওয়াল ফেরা আইন ছঙ্ঘড্ডঘ্ঞ্চ লঙঘনে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং গাড্ডায় পড়েছেন দেখে দিল্লী গিয়ে ওখানকার উচ্চ আদালতে আগাম জামিনের আবেদনও জানিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডে মারাণ্ডি-কংগ্রেস আঁতাত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত যা খবর, তাতে বাবুলাল মারাণ্ডির হাত ধরে ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনী বৈতরণী পেরোতে চাইছে কংগ্রেস। তবে আসন ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও একদা বিজেপি নেতা বাবুলাল মারাণ্ডির পার্টি, ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চার সঙ্গে কংগ্রেসের মনোমালিন্য চরমে উঠেছে এই মুহূর্তে। ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চার বা জে ডি এমের দাবী ঝাড়খণ্ডের ৮১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩১টি চাই তাদের। অন্যদিকে কংগ্রেসের বক্তব্য, টেনেটুনে বড়জোর ২৬টি আসন দেওয়া যেতে পারে জে ভি এম-কে। তার বেশি নয়। তবে এনিয়ে কংগ্রেসের চাপ পালটা চাপের খেলা পুরোপুরি অব্যাহত রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের নির্বাচন নিয়ে সোনিয়া গান্ধীর বাড়িতে আয়োজিত একটি বৈঠক সেরে বেরিয়ে এসে এআইসিসি-র ঝাড়খণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা কেশব রাও বলেছেন, "এই মুহূর্তে যেটুকু ঠিক হয়েছে যে, আমরা ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনে একক প্রয়াসেই লড়াই করব।" কংগ্রেস সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঝাড়খণ্ডের ভোটে পার্টির প্রার্থীদের নাম প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও কংগ্রেস বাবুলাল মারাণ্ডি শেষপর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেন, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যে

বাবুলাল মারাণ্ডি

কারণে রাও বলেছেন, 'যদিও প্রার্থীদের নাম কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি একপ্রকার নির্ধারিত করেই ফেলেছে কিন্তু চূড়ান্ত নাম ঘোষণার আগে আরেকবার কার্যকরী সমিতি বসতেই পারে।'

ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা এক কংগ্রেসী নেতার কথায়—'জেভিএমের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা এখনও চলছে। শেষ অবধি কি হবে তা এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে আসন বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে কংগ্রেস খুব সন্তর্পণে সুকৌশলে এগোতে চাইছে। কংগ্রেসের হিসেব অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণা এলাকায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বেশ ভালো প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এর বাইরে ঝাড়খণ্ডের বাকি অংশে বাবুলালের সেরকম প্রভাব না থাকার দরুণ কংগ্রেস সাঁওতাল পরগণার অধিকাংশ আসন তাঁর হাতে ছাড়তে চাইলেও রাজ্যের বাদবাকি অংশে চাইছে না। শেষ খবর হল, আসন রফা হয়ে গেছে।

অন্যদিকে কোডারমার বাইরে নিজের সংগঠন বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছেন মারাণ্ডি। প্রসঙ্গত, রাজ্যে ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চার শিবরাত্রির সলতে হিসেবে একমাত্র সাংসদ রয়েছেন মারাণ্ডি এবং তাঁর কেন্দ্রটি হলো কোডারমা।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়েছিল শিবু সোরেনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং লালু প্রসাদের আর জে ডি-র ভোটে নিজের বাদে বাকি সব আসনে বেশ ভালোভাবে হারার পর ইউপিএ সরকারকে বাইরে থেকে নিঃশর্ত সমর্থনের আবদার করেন মারাণ্ডি। সেই সূত্র থেকেই এবার ঝাড়খণ্ডে হাওয়া উল্টোদিকে বুঝে কংগ্রেস রফা করার চেষ্টা করে মারাণ্ডির দলের সঙ্গে। সুতরাং বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে গড়া এই জোটের ভবিষ্যত ' দেবাঃ ন জানন্তি-কুতো মনুষ্যাঃ।'

নয়া ভিসা আইনে দুটি প্রকল্পের ক্ষতি

সংবাদদাতা।। সরকারের নতুন ভিসা আইনের কারণে প্রভাবিত হয়েছে হিমাচল প্রদেশের দুটি বড়সড় রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প। বাণিজ্যিক ভিসার সুযোগ গ্রহণ করে বিদেশীরা আর ভারতে কাজ করতে পারবে না।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে হিমাচল প্রদেশের আপেল বেল্টে আটকে গেছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ। এই নয়া ভিসা আইনের কারণে বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থানুকূল্যে নির্মীয়মাণ দুটি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প মুখথুবড়ে পড়েছে। পার্বত্য রাজ্যটিতে সড়ক পথ নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিল চীনভিত্তিক লংজিয়ান রোড এবং ব্রীজ কোম্পানি লিমিটেড। বাণিজ্যিক ভিসার মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার আগেই এই দুটি কোম্পানির প্রায় ৮০ জন চীনা ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিক ভারত ত্যাগ করেছেন। দুটি সড়ক প্রকল্প হল— থিয়ং-কোটখাই-হাইকোটি-বোহরু এবং মেহতাপুর-উনা-আম্বে। প্রথমটি সিমলা জেলার আপেল উৎপাদনকারী এলাকার অন্তর্গত এবং রাস্তাটি নির্মিত হলে দ্রুত ফসল পৌঁছে যেত বাজারে।

১ গীতাঞ্জলি ১ গীতাঞ্জলি ১ গীতাঞ্জলি ১ গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলির শতবর্ষে পদার্পণ ও রবীন্দ্র-ভাবনা

ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

হেমন্তের বিকাল। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার বাঁধানো বেদিতে বসে ছিলেন এক ঋষি। তাঁর ঢেউ খেলানো চুলে-দাড়িতে রূপালি রেখা, সুগঠিত করোটিতেও শুক পাখির চঞ্চুর মতো বক্র নাসিকা---আর্যের লক্ষণ। এই ঋষিপ্রতিম পুরুষের নাম রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজি হিসাবে সময়টা ১৯১৩ খৃস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর। এমন সময় পিয়ন এসে তাঁকে দিলে এক টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটি এসেছে---সুদূর সমুদ্রপারের দেশ সুইডেন থেকে। টেলিগ্রাম পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের শান্ত সৌম্য প্রশান্ত মুখে ফুটল মৃদু হাসি। "কি আছে ওতে?" বলে---ততক্ষণে সমাগত সুপণ্ডিত অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন; আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী ঝুঁকে পড়লেন,---রবীন্দ্রনাথের হাতের পত্রটার দিকে। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামটি বাড়িয়ে দিলেন ওঁদের দিকে। ক্ষিতিমোহন পড়লেন,---"সুইডিস নোবেল কমিটি এই বছর (১৯১৩), এশিয়ার দার্শনিক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত হলেন।"

পুরস্কার প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থটির নাম গীতাঞ্জলি (Song Offerings)। দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদটি---এশিয়ায় প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রাপক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্বেষ পরায়ণ নিন্দুকের অভাব ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তারা প্রশ্ন তুললেন,---মহাকাব্য রচনা করেননি রবীন্দ্রনাথ। কাজেই মহাকবি হন কেমন ভাবে? সত্য কথা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে আড়াই হাজার গান লিখেছেন, মহাকাব্য রচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ নিন্দুকদের জবাব দিলেন গানের ভাষায়,

'ভেবেছিলেম নামব আমি
মহাকাব্য সংরচনে।
হঠাৎ তোমার কাঁকন লেগে
হাজার গীতে গেল— ভেঙে...'

পৃথিবীতে আর কোনও কবি আড়াই হাজার গান রচনা করতে পারেননি। তাই গানের মহাসাগর সঙ্গীতেই মহাকাব্যের চিরন্তন বাণী বিধৃত।

গীতাঞ্জলির প্রথম প্রকাশকাল ---১৯১০ খৃ:। বাংলা কাব্যগ্রন্থ নোবেল পুরস্কার পায় কেমন করে? ইংরেজি, ফরাসি, প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় লেখা পুস্তক ---নোবেল পুরস্কারের প্রাপক।

এক বিচিত্র যোগাযোগের ফলেই

> **পৃথিবীতে আর কোনও কবি আড়াই হাজার গান রচনা করতে পারেননি। তাই গানের মহাসাগর সঙ্গীতেই মহাকাব্যের চিরন্তন বাণী বিধৃত।**

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কবিতাগুলির ইংরেজি রূপান্তর ঘটে। প্রখ্যাত ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন ভারত পরিভ্রমণে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের গৃহে আসেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে মুগ্ধ হন। তাঁকে ইংল্যান্ডের বিদ্বজনমহলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উৎসুক হন। আমন্ত্রণ জানান। এদিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনেও পালাবদল ঘটেছে। পদ্মাতীরের প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্য মাধুর্যের "সোনার তরী" সোনালী ফসলে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরে। কথা-কাহিনীর কাব্যময় জগৎসৃষ্টি করে নৈবেদ্য, খেয়া, উৎসর্গের মধ্যে নূতন পথের সন্ধান করছেন। প্রকৃতি প্রেম, সৌন্দর্য, মাধুর্য সাধনার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে স্বদেশচিন্তা---কারণ ছিল, শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিজয় ঘোষণা (১৮৯৩) ভারতে গণচেতনার উদ্বোধন ঘটায়। তারুণ্যশক্তি স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়---গড়ে ওঠে আত্মোন্নতি (১৮৯৭), অনুশীলন (১৯০২), যুগান্তর (১৯০৬), প্রভৃতি বিপ্লবী সমিতি। অরবিন্দ ঘোষ বরোদায় অধ্যাপনার চাকরি ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ঘোষণা করেন---'We demand absolute autonony free from British Control – (1906).'

স্বদেশী যুগ শুরু হয়। লর্ড কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ জাতির প্রাণে আঘাত দেয় (১৯০৫)। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সংগীত রচনা শুরু করেন— 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক', 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ইত্যাদি স্বদেশী চারণ কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাখীবন্ধন উৎসবের সূচনা করেন। বাঙালী বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। কৈশোরের জোড়াসাঁকোর গৃহে অরবিন্দ মাতামহ মনীষী রাজনারায়ণ বসু, নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে গড়ে ওঠেছিল গুপ্ত বিপ্লবী সভা— প্রেরণা ইটালির ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডীর "কার্বোনারি পার্টি"। ঠাকুর বাড়ির গুপ্তসভার নাম ছিল, 'সঞ্জীবনীসভা'। এ সভায় নিজের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার হোত। ওই ভাষায় সঞ্জীবনীসভাকে বলা হোত "হাম চ পামুহাফ্"। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটি ছিল বালখিল্য ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহে এই "বিপ্লবী দলের" সভ্য হয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে মারাঠা বিপ্লবী বাল গঙ্গাধর তিলকের অনুপ্রেরণায় লিখেছিলেন, 'শিবাজী উৎসব" কবিতা (১৯০৪)। অরবিন্দ ঘোষ কারারুদ্ধ হলে 'নমস্কার" কবিতায় বন্দনা করেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দানের প্রযত্ন করেন। রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন---রক্তাক্ত বিপ্লব---সহিংস সশস্ত্র সংগ্রামের উপযোগী ছিল না। বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। মজফঃরপুরে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর বোমা ফাটল অত্যাচারী ইংরাজ কিংসফোর্ডকে মারতে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো (১৯০৮)। বিশ্বাসঘাতক দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জিকে কুকুরের মতো গুলি করে মারা হলো (১৯০৯)। গোয়েন্দা, অত্যাচারী ডি. এস. পি. স্যামসুল আলম হাইকোর্ট চত্বরে গুলিবিদ্ধ হন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের কোমল কবিচিত্ত কিছুটা শঙ্কিত হলো। তাঁর হৃদয়ে আরেকবার ধ্বনিত হলো। "এবার ফিরাও মোরে"---একবার সৌন্দর্য, প্রেম, প্রকৃতির মায়াময় থেকে সংসারের সংঘাতময় কর্মমুখর জগতে ফিরেছিলেন। এবার স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত ভয়াল ছবি তাঁকে আত্মসংবরণে

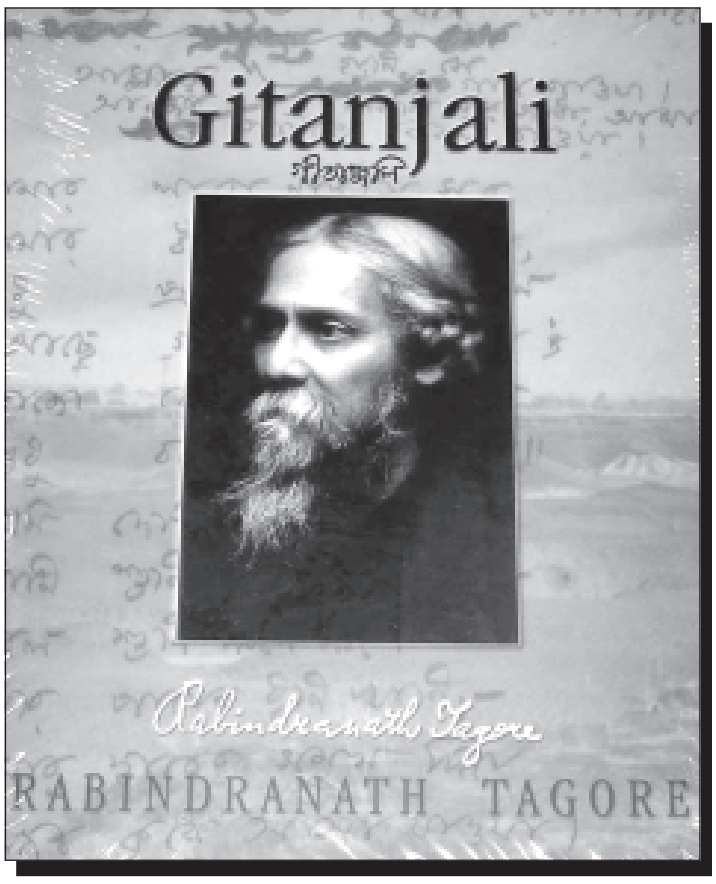

বাধ্য করল। তিনি মনে করলেন,---এ পথে শান্তি নেই, মঙ্গল নেই। তাই গানের জগতে প্রত্যাবৃত হলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে 'উৎসর্গ' 'খেয়া-র' অনবদ্য কবিতাবলী, 'নৈবেদ্যে' স্বাজাত্যবোধ ও আত্মজাগরণের অনুপম কবিতাগুলি লেখা হয়ে গেছে। তবে ফাঁসিমঞ্চে র সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবীদের প্রতি কেন তাঁর অনীহা তা আমাদের বেদনার্ত জিজ্ঞাসা। কেন তিনি 'বাঘা যতীনের' বালেশ্বরে সম্মুখ সমরে আত্মদানের বৎসর (১৯১৫)-এ লিখলেন "ঘরে বাইরে" যার নায়ক ভণ্ড, ভীরু "বিপ্লবী" (?) সন্দীপ। যে অভিজাত পরিবারের বধূর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় করে। সিনেমা পরিচালক সত্যজিৎ রায় চুম্বন করিয়েছেন সন্দীপ-বিমলাকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এতদূর অগ্রসর হননি। ইংরেজরা তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বারো বছর বাদে "জালিয়ানওয়ালা বাগ"-এ গুলি চালানোর প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে দেশবাসীর অভিনন্দন লাভ করেন (১৯১৯)।

রবীন্দ্রনাথ ভয়াল অগ্নিযুগের উত্তাপ ছড়িয়ে ফিরে যান তাঁর গানের জগতে। রূপসাগরে ডুব দিলেন অরূপরতন আশা

(এরপর ১৩ পাতায়)

নিভৃত প্রাণের দেবতা ঃ এক

অর্ণব নাগ

"যতদিন বাংলাদেশ, বাংলাভাষা
বাঙালীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
ছুঁয়ে যাবে চেতনার উন্মুক্ত চাতাল
ততদিন হৃদয়ের তন্ত্রীতে-গ্রন্থিতে
একটাই নাম করে দেবে মাত
রবীন্দ্রনাথ নইলে অনাথ।"

ওপরের কথাগুলো এখনকার এক ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের। যিনি মনে করছেন, নোবেল পুরস্কার হলো অলঙ্কার, আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের অহঙ্কার। মোটামুটি একটা বিষয়ে একমত হচ্ছেন তিন স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী— ইন্দ্রাণী সেন, লোপামুদ্রা মিত্র এবং স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত; যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পেলেও কি আর না পেলেই বা কি! তাতে বাঙালীর কিছু যায়-আসে না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর প্রাণের ঠাকুর।

স্বাগতালক্ষ্মী বলছেন, যদি রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রত্যেকটির জন্যেই গুরুদেবকে নোবেল পুরস্কার দিতে হোত তবে শ-খানেক নোবেলেও হয়তো কুলোত না। ইন্দ্রাণী আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, "নোবেল পাওয়াটা কোনও ব্যাপার নয়। ওবামাও তো নোবেল পেলেন। তাই বলে তাঁর সঙ্গে কি রবীন্দ্রনাথের তুলনা টানাটা ঠিক হবে?" তবে রবি ঠাকুরের নোবেল পাওয়া নিয়ে স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তের আফসোসটা একটু অন্য ধরনের। তাঁর বক্তব্য, "রবীন্দ্রনাথ যার জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন তা হলো ইংরেজি অনুবাদ। আমার খুব আফসোস হয়, যারা নোবেল পুরস্কার দিচ্ছেন তাঁরা তো বাংলা ভাষাটা বোঝেন না। রবীন্দ্রনাথের ভাব তাঁরা কীভাবে ধরবেন?" খুব খাঁটি কথা। ১৯১০ সালে প্রকাশিত হলো কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি'। ১৯১২ সালে তাঁর ইংরেজি অনুবাদের নামকরণ হয় "Song Offerings"। এই অনুবাদটাই পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত

শিল্পী-সাহিত্যিকদের স

হয়। এ নিয়ে লোপামুদ্রা মিত্রকে প্রশ্ন করতে ফোনের মধ্যেই তাঁর মাপা হাসির সঙ্গে চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাও বেশ টের পাওয়া গেল। জানালেন, "নানারকম Controversy রয়েছে এই বিষয়ে। নাই বা বললাম সেসব

১ গীতাঞ্জলি ১ গীতাঞ্জলি ১ গীতাঞ্জলি ১

রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান যুগ

ডঃ বিভাস কুমার সরকার

অন্যান্য অনেক তারিখের মতো ২৫ বৈশাখ ও ২২ শ্রাবণ তারিখ দুটিও বছর বছর ঘুরে ঘুরে আসে। এদের মধ্যে একটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুণ্য আবির্ভাব, অন্যটি বেদনার্ত তিরোভাব তিথি। প্রত্যেক বছরই সেই মহামানবের জন্ম ও বিদায়ের দিন দুটি দিকে দিকে উদ্‌যাপিত হয় মহা আড়ম্বরে---নৃত্যগীত, সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহযোগে। ধূপের ধোঁয়া, ফুলের সৌরভ এবং বক্তৃতা সমাহারে বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনে লাগে উৎসবের ছোঁয়া। বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ এই বাংলায় বস্তুত বৈশাখ মাসের ২৫তম এবং শ্রাবণ ২২তম দিন দুটিও একরকম তাই পার্বণ বিশেষ।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের এই প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে স্বভাবতই একবার দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে ইচ্ছা জাগে। মানুষের আজ বড় দুর্দিন। অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ভ্রান্ত রাজনীতির শিকার আজ বাঙালী। যে শিক্ষা মানুষকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার প্রেরণা যোগায়, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চাপে সেই শিক্ষাও আজ বিকারগ্রস্ত। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা---যার মাপকাঠিতে একটি ছাত্র বা ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়, সেই সব পরীক্ষাও প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পাচারের ঘটনায় লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত। সামান্য অর্থের লোভ মানুষকে আজ যথেচ্ছাচারে উদ্দীপিত করে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। জীবন্ত মানুষের অঙ্গচ্ছেদ ঘটানো, মেয়ে পাচার, প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল এলাকায় নিরপরাধ অসহায় মানুষের উপর শারীরিক নিপীড়ন এবং পরিশেষে পেট্রোল ছিটিয়ে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করার পৈশাচিক সমবেত উল্লাস, রাজনৈতিক হত্যা, সন্ত্রাস---এসব আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাদের দায়িত্ব---গণতান্ত্রিক দেশের সেই পুলিশ প্রশাসন আজ পঙ্গু ও দুর্নীতিগ্রস্ত। পুলিশের হেফাজতে বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু আজ দৈনন্দিন ঘটনা। উৎকোচের কৃষ্ণবর্ণ হস্ত আজ বহুদূর প্রসারিত। অর্থের বিনিময়ে আজ চাকুরি থেকে আদালতের রায়----- সমস্ত কিছুই ক্রয়যোগ্য। কবিগুরু যে স্বপ্ন নিয়ে একদিন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে ছিলেন; মানুষের শুভবুদ্ধি জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী স্বরূপ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একদিন সমগ্র বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার মতো 'অশান্তি নিকেতন' আজ আর দ্বিতীয়টি নেই। ওই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণে ইচ্ছুক নন দেশের কোনও শিক্ষাবিদই। কারণ ওই পদটি এখন ঘেরাও এবং আন্দোলনে কণ্টকিত। পঠন-পাঠন ব্যতীত সেখানে অন্য সব কিছুই নিত্য অনুষ্ঠিত হয়। কবিগুরুর স্মৃতিধন্য বিদ্যাশিক্ষার সেই পুণ্য অঙ্গন আজ রক্ত-লাঞ্ছিতও। সমাজের এই সর্বব্যাপী অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতাকে প্রেক্ষাপটে রেখে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্র সাহিত্য আজ কতটা প্রাসঙ্গিক? আধুনিক কবিদের পুরোধা বুদ্ধদেব বসু একসময় রবীন্দ্র বিরোধিতায় মুখর হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর ভুল ভাঙে। তখন তিনি কবিগুরুকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে লেখেন---আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব বাতাসের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক। তাঁর আর স্বতন্ত্র স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধদেব বসুর

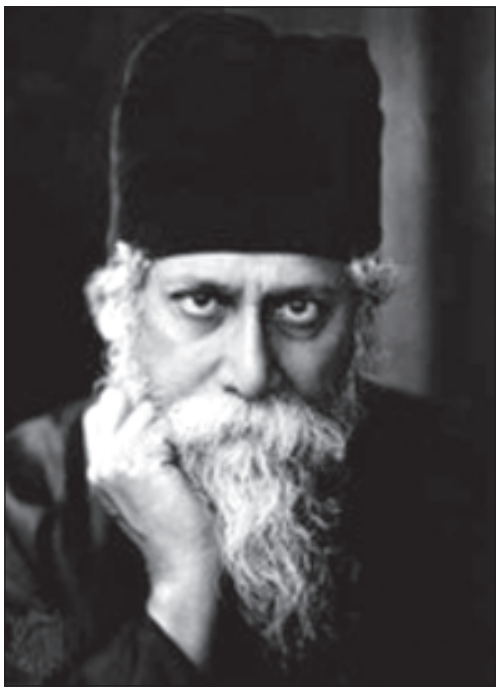

মতো একালের কোনও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের মুখে এই বাণী কি পুনর্বার উচ্চারিত হবে?

'১৪০০ সাল' শীর্ষক কবিতায় কবিগুরু লিখেছিলেন---'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে।'---১৪০০ সালেও যে তাঁর কবিতা কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে---সে বিষয়ে কবি নিঃসন্দেহ ছিলেন। এই শতাব্দীর মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি অশ্রুতে তাঁর বিদেহী সত্ত্বা মিশে থাকবে---এরকম কল্পনাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। বস্তুত কালের অমোঘ নিয়মে যুগের পরিবর্তন হয়তো ঘটেছে; মানব সমাজের নানাবিধ সমস্যা নবনব রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। যদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, তার মধ্যে অনেক সমস্যা সমাধানের বাণী আজও রয়ে গেছে।

চিন্তা করা যাক, 'দেনাপাওনা' শীর্ষক গল্পের নিরুপমার কথা। তার মনের মুকুরে বাংলা দেশের চিরবঞ্চি তা, নিপীড়িতা নারীর রূপ কি প্রতিবিম্বিত হয়নি? একালে নারীশিক্ষার অনেক প্রসার ঘটেছে। নারী তার অন্তঃপুরের গণ্ডী ছেড়ে বের হয়ে এসেছে বহির্বিশ্বে; অর্জন করেছে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার! কিন্তু পণপ্রথা কি আজও এই সমাজের কলঙ্ক নয়? টাকাকড়ির লেনদেন কি আজও অনেক বিবাহের নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায় না? রায় বাহাদুরের মহিষীর মতো অর্থপিপাসু স্বার্থসর্বস্ব কোনও নারী দূরে থাকা পুত্রের উদ্দেশ্যে যদি লেখেন---'বাবা তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।' এবং তার মনোগত অভিপ্রায় যদি হয়---'এবার বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।' তাহলে একালের পরিপ্রেক্ষিতে তা কি খুবই অস্বাভাবিক শোনাবে?

বিচ্ছিন্নতাবাদ তথা জাতপাতের সমস্যা আজ ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা। সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত দেশ আজ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে বসেছে। একালের তথাকথিত বলিষ্ঠ কবি সাহিত্যিক এ বিষয়ে কতটা সচেতন? সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা তাঁদের সাহিত্যে কোথায়? এ বিষয়ে কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য নীরব নয়। সেই সুদূর অতীতে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'গোরা' উপন্যাস। উক্ত উপন্যাসের শেষে উপন্যাসের নায়ক গোঁড়া সংস্কারান্ধ গোরার উত্তরণ ঘটল জাতিধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়হীন সংস্কার মুক্ত এক মানুষ হিসেবে। এই ধরনের বলিষ্ঠ চরিত্রই তো আজ মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। যে গোরার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করবে মহামিলনের এই মন্ত্রধ্বনি---'আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনও সমাজের কোনও বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।' যে গোরার মতোই প্রার্থনা করবে, আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই---যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনও জাতির কাছে কোনওদিন অবরুদ্ধ হয় না---যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।'

কিম্বা মনে করা যাক, বিস্মৃত ইতিহাস থেকে তুলে আনা সেই শিবাজীর ভাবমূর্তি যিনি খণ্ডচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে এক ধর্মরাজ্যপাশে বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিলেন---

'কোন দূর শতাব্দের কোন এক
অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের
অন্ধকারে বসি
হে রাজা শিবাজি
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা
তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি---
এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'

(শিবাজি উৎসব)।

ইদানীং বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নতুন করে নানা অপপ্রচার শুরু হয়েছে। স্বার্থান্বেষী কিছু বিদেশী সমালোচক এদেশীয় কিছু তথাকথিত কবি সাংবাদিকের মদতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কুৎসা প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। সমালোচক নামধারী এইসব কুচক্রীরা এতদিন পরে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণেও পশ্চাৎপদ নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবিতকালে যেমন তেমনি মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বারবার সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু সেইসব সমালোচনা শুষ্কপত্রের মতোই বারবার খসে পড়েছে; আর অম্লান জ্যোতিতে নতুনতর মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসাহিত্য। আমাদের স্থির বিশ্বাস, ইদনীংকালের এইসব অকিঞ্চিৎ ৎকর সমালোচনার স্থান হবে আবর্জনার স্তূপে। তাহলেও আমাদের সতর্ক হতে হবে; বলিষ্ঠ প্রতিবাদে বুঝিয়ে দিতে হবে--- রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির জগতে এক অমূল্য সম্পদ, এক সগৌরব উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের শোকে সান্ত্বনা, আনন্দের ইন্ধনে; জীবনকে ভালোবাসার, জগৎকে ভালোবাসার প্রকৃতিতে ভালোবাসার এ এক বলিষ্ঠ দলিল। একে কেড়ে নেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।

পরিশেষে একটি কথা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। তা হলো, রবীন্দ্র জন্মতিথি বা মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপনের প্রকৃত তাৎপর্য নৃত্যগীত, বক্তৃতা সমাবেশের মধ্যে নেই---নিহিত আছে রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাপক পাঠ ও প্রচারের মধ্যে। রবীন্দ্রসাহিত্যের সুবিশাল সমুদ্রে যে অজস্র রত্ন মণিমুক্তা ছড়ানো আছে, তাদের তুলে আনতে হবে; নব সজ্জায় সজ্জিত করে তুলতে হবে জীবনকে। তবেই হবে— সার্থক ভাবে রবীন্দ্র জন্ম বা মৃত্যুতিথি পালন।

া ঃ একলা চলার রবিঠাকুর

কথা। আমার কাছে এটা কোনও ব্যাপারই নয়।" সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের মতে, "নোবেল পুরস্কার গুরুদেবের কখনোই যথার্থ অভিজ্ঞান হতে পারে না। কারণ নোবেল পুরস্কারের একটা সীমাবদ্ধতা আছে।"

সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "রবি ঠাকুর আমাদের কাছে একজন নোবেল লরিয়েট।" যে সময় ইন্দ্রাণী - লোপামুদ্রা-স্বাগতালক্ষ্মীরা গাইতে শুরু করেছিলেন, তারপর রবীন্দ্রগানের যাত্রাপথে বহু পথ অতিক্রম করার পর গুরুদেবের সত্ত্বা কি আদৌ পাল্টে ছে তাঁদের কাছে? ওঁরা তিনজনই জানাচ্ছেন, যখন তাঁরা গান শিখতে বা পরে গাইতে শুরু করেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মানে অনেকটাই পাল্টে ছে। আগে স্বরলিপির অনেক কড়াকড়ি ছিল। তার ওপর খুব অল্প বয়সে গানেরও সব কথা বুঝতাম না। একেকটা বয়সে রবীন্দ্রনাথের গানের কথার মানেও একেকরকমভাবে যেন বুঝতে পারি।" যার প্রতিধ্বনি করেছেন সাহিত্যিক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়— "রবিঠাকুর আমার কাছে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবে আবিষ্কৃত। তা আজও ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে গীতাঞ্জলির শতবর্ষে পদার্পণ নিঃসন্দেহে বিশাল ব্যাপার।"

ছেলেবেলায় রবিঠাকুরকে স্বাগতালক্ষ্মী যেন বলতে চাইতেন— 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।' আর এখন বলছেন— 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই'। সেই প্রাণপণে চাওয়া থেকেই বহু বাসনার আস্ত গীতবিতানটাই রেকর্ড করেছেন স্বাগতালক্ষ্মী। এবার ইচ্ছে রয়েছে গীতাঞ্জলি নিয়ে কাজ করার। লোপামুদ্রা মিত্রের কাছে রবীন্দ্রনাথ মানে অনেক আগেকার কোনও মানুষ নন। তিনি যেন নিজেদের লোক। সেই কারণেই আজকের সময়ের দর্পণে

(এরপর ১৩ পাতায়)

হিত্যিকদের সাক্ষাৎকার

বোঝার বয়সটা তাঁদের ছিল না। তাঁদের কথায়, যে রবি ঠাকুরকে তাঁরা খুঁজতেন গানের জগতে প্রবেশের প্রারম্ভে আজ এতদিন বাদে রবীন্দ্রনাথ যেন অন্যরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছেন তাঁদের কাছে। ইন্দ্রাণী যেমন বলছেন, "আমার

ধবংসের মুখে পাকিস্তান

একেই বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। ধর্মের ভিত্তিতে, অর্থাৎ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' (হিন্দু-মুসলিম এক জাতি নয়)-এর ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান ক্রমশ ধবংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ভারত বিরোধী। পাকিস্তানের শাসকবর্গ, ইসলাম-পন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এবং 'জেহাদী'রা ভারতের ধবংসই চেয়ে এসেছে এতদিন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশভাগের অব্যবহিত পরে পাক হানাদার বাহিনী রাতের অন্ধকারে কাশ্মীরের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে নেয়। যা বর্তমানে তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর। কিন্তু কাশ্মীরের খানিকটা দখল করেই তারা ক্ষান্ত বা সন্তুষ্ট থাকেনি। পুরো জম্মু-কাশ্মীরকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল তারা। যদিও সে সাধ তাদের পূর্ণ হয়নি আজও। তবে চেষ্টার ত্রুটি তারা রাখছে না। কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান আক্রমণ করে ভারতকে। কিন্তু কাশ্মীর দখলের সাধ তাদের অপূর্ণই থেকে যায়। উল্টে পাকিস্তান পায় দাঁতভাঙা জবাব। আবার ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে মুক্তি সংগ্রাম শুরু হলে বিপ্লবী সরকারের অনুরোধে ভারত সেই মুক্তি সংগ্রামকে জানায় নৈতিক ও সামরিক সমর্থন। ফলে পাকিস্তান ভারতকে উচিত শিক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামকে গুঁড়িয়ে দিতে পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। কয়েক দিনের যুদ্ধেই পাকিস্তান পর্যুদস্ত, আবির্ভাব ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। গর্বের পূর্ব পাকিস্তানকে হারিয়ে পাকিস্তান হয়ে ওঠে আরও ভারত বিরোধী। তারা পূর্ব পাকিস্তানের আশা পরিত্যাগ করে। অন্যদিকে তাদের কাশ্মীর দখলের স্বপ্নও যায় প্রায় মিলিয়ে।

এমতাবস্থায় পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী ভারত ধবংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আই এস আই (পাক গুপ্তচর সংস্থা) -এর মাধ্যমে পাকভূমিতে গঠন করে অসংখ্য ইসলামি সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গি সংগঠন। সরকারি মদত, অর্থানুকুল্য ও সামরিক সহায়তায় গড়ে তোলা হয় জঙ্গিপনার প্রশিক্ষণ শিবির। সেই শিবিরে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র জঙ্গিদের ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, ভারতের অভ্যন্তরে নাশকতা ও অন্তর্ঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে।

ভারত কিন্তু প্রথম থেকেই ভারতে জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের পিছনে পাকিস্তানের হাত আছে বলে পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুললেও আন্তর্জাতিক মহল তাকে ততটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আমেরিকার ৯/১১, মুম্বাইয়ের ২৬/১১ কাণ্ড, আফগানিস্তানে তালিবান ও আল কায়েদা জঙ্গিদের ধবংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং শান্তিরক্ষায় কর্মরত মার্কিন সেনা-কর্মী ও মার্কিন নাগরিকদের ওই সব জঙ্গি টার্গেট করায় আমেরিকাসহ পশ্চিমী দুনিয়া এতদঞ্চলে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ কায়েমের জন্য পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর তার সব তথ্য -প্রমাণ পাকিস্তানের সামনে উপস্থাপিত করলে পাকিস্তান মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। আমেরিকা শর্ত আরোপ করে---পাকিস্তান যদি জঙ্গি দমনে উদ্যোগী হয় তবেই তাকে জঙ্গি দমনের জন্য প্রভূত অর্থ দেওয়া হবে এবং অন্যান্য খাতে অর্থ সাহায্যও অব্যাহত থাকবে। অন্যথায় সব আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আর্থিকভাবে দেউলিয়া পাকিস্তান ভয়ে আমেরিকার শর্তে রাজী হতেই সব জঙ্গিগোষ্ঠী একযোগে পাকিস্তান জুড়ে শুরু করে ধবংসাত্মক তাণ্ডব। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকে প্রতিদিন। ফলে হতাহত হয় বহু মানুষ। সম্পত্তিরও হয় ব্যাপক ক্ষতি। এখন পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীও সর্বাত্মক আঘাত হানছে জঙ্গিদের ওপর। আমেরিকাও ছুঁড়ছে 'ড্রোন' ক্ষেপণাস্ত্র। ফলে মারা পড়ছে বহু জঙ্গি। আর এই অঘোষিত ইসলামিক জেহাদে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে পাকিস্তান। ভারতকে ধবংস করতে গিয়ে পাকিস্তানই এখন ধবংসের মুখে!

---ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চিঠিপত্র

মুসলিম ও কমিউনিস্ট ভাই-ভাই

সম্প্রতি স্বস্তিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন কমিউনিস্ট এবং মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে দিয়েছে। এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হলেও, গোপনে হাতে হাত মিলিয়ে ভারতে নানারকম অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।

রাশিয়াকেই বলা হয় কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের জনক। এখন সেদেশের মানুষের কাছে তা প্রায় পরিত্যক্ত। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাশিয়া তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য কায়েম করতে যে কমিউনিস্ট বীজ বপন করেছে, তা থেকে ক্রমশ যেসব বিষবৃক্ষ তৈরি হচ্ছে, তার বিষাক্ত বাতাস সেই সব দেশে একের পর এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

রাশিয়ান কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিধবস্ত হওয়ার পরে এখন সারা দুনিয়ার ত্রাস মাওবাদী চীনা কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য। রাশিয়ান কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ আর চীনা কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ এক নয়। তবে চরিত্রগত দিক থেকে দু'দেশের মূল লক্ষ্য সারা পৃথিবী জুড়ে অন্যদেশের শিল্পবাণিজ্য ধবংস করে নিজেদের বাণিজ্য ক্ষেত্র চিরস্থায়ী করা। যা কতকটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় এগিয়ে চলার গতিপ্রকৃতি। তারা বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য খৃস্ট ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করত। রাশিয়ানরাও বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট দল তৈরি করত। তবে এসব কাজে তারা প্রধানত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা করে দরদী ভূমিকা পালন করত; কিন্তু চীনের ভূমিকা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তরা মাওবাদী সন্ত্রাস চালিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে ইন্ধন জোগায়। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জমি দখল করে রাষ্ট্রের সীমারেখা বৃদ্ধির দিকেই তাদের নজর বেশি।

এভাবেই চীনের এই বিশাল আয়তন সৃষ্টি হয়েছে। তারপরেও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলকে দখল করার জন্য তৈরি করেছে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা। অল ত্রিপুরা টাইগারস ফোর্স। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ত্রিপুরা। ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা বোড়োল্যাণ্ড এবং অল আদিবাসী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির মতো অনেক বিচ্ছিন্নতাবাদী দল। এইসব দলের লোকের সঙ্গে একান্তে বসে আলোচনা করলেই জানা যায় চীন কীভাবে এদের অর্থ সাহায্য করছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর চীন সফরের পর দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু হয়; কিন্তু তার আগে চোরাপথেই চীন ভারতে তাদের মালপত্র পাচার করত। সেই অর্থের একাংশ যেতো ওই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর হাতে। এখন তো এসব আর রেখে ঢেকে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এখন চীনের গবেষণাগার থেকেই প্রচারিত হচ্ছে কীভাবে ভারতকে ২০ থেকে ৩০টি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে ভাগ করে তারা তাদের সাম্রাজ্য কায়েম করতে পারবে। এর সঙ্গে সহযোগী হিসেবে তারা পেয়েছে পাকিস্তান এবং বালাদেশের মতো দুটি মুসলমান রাষ্ট্রকে।

--- শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

ধর্মনিরপেক্ষতার 'বলি' হিন্দুরাই

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলা হয়ে থাকে সত্যি। কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা কোথায়, চোখে দেখা যায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের তীর্থদর্শনে যেতে হলে দিতে হয় তীর্থকর আর মুসলমানদের হজযাত্রার জন্য দেওয়া হয় সরকারি অনুদান। হিন্দুরা রামমন্দির এর জন্য বললে বা কোন হিন্দুর ওপর অত্যাচার হলে, মুসলমানরা মন্দির অপবিত্র করলে প্রতিবাদ যদি হিন্দুরা প্রতিবাদ করে তাহলে সাম্প্রদায়িক তক্মা দিয়ে তাদের হেয় করা হয়। মুসলমানরা অনেক স্থানে জোর করে হিন্দু মেয়েকে নিয়ে যায়, হিন্দু গ্রামের সামনে প্রকাশ্যে গো হত্যা করে, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণের মতো ঘটনা তো প্রায়ই চলতে থাকে কিন্তু এর জন্য সুবিচার পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। খৃস্টান পাদ্রীরা ছলে, বলে, কৌশলে বা স্বার্থান্বেষী সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণ করছে। বর্তমানে একটা চক্রান্ত করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলাতে ডিমাসা ও জেমি নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী হিংসার সৃষ্টি করে তাদের স্বার্থ পূরণের চেষ্টায় নরমেধ যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। ভালো করে তদন্ত করলে রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে। ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশে সবার জন্য সমান অধিকার থাকা চাই। কিন্তু আমাদের দেশে এ কেমন আইন? সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু দুইভাগে ভাগ করে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে শুধু মুসলমানদেরকে। সংখ্যালঘু উন্নয়ণ পরিষদ গঠন করে তাদের জন্য আলাদা প্যাকেজ, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বিশেষ অনুদান, জন্ম নিয়ন্ত্রণেও হিন্দুদের জন্য দুইটি বা তিনটি সন্তান যথেষ্ট বললেও মুসলমানদের জন্য দশটি বা পনেরোটিও যথেষ্ট নয়, এই হিসাব ধর্মনিরপেক্ষ দেশের। রাজ্য ভিত্তিক সংখ্যালঘু হিসাব করলে কাশ্মীরের হিন্দুরা সংখ্যালঘু মেঘালয়ে, মিজোরামে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, অসমে তো প্রায় সমান-সমান। কিন্তু হিন্দুরা তো সংখ্যালঘু মর্যাদা কোথাও পায় না। এ কেমন ধর্ম-নিরপেক্ষতা? তাহলে কি আমাদের দেশের মেকি সেকুলারবাদী নেতারা দেশকে আবার ভাগ করার জন্য এইকাজ করে যাচ্ছেন? যদি না হয় তবে মুসলমানদের জন্য এত প্রাণ কাঁদে কেন? তাই আজ সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু ভাইদের প্রতি আমার বিনম্র নিবেদন, আপনারা নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে সকলে একই মঞ্চে আসুন। ভারতমাতাকে রক্ষা হিন্দু ছাড়া অন্য কেউ করবে না।

---শ্যামলকান্তি নাথ, উত্তর কাছাড়, অসম।

পিটিটি আই ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা

জ্যোতিবাবুর সময় থেকে শুরু করে বুদ্ধবাবুর সরকার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের N.C.T.E. Act কে অগ্রাহ্য করে প্রায় ৭০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবস্থা করে দেয়। ওই ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারের সাম্প্রতিক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সরকার তাদের কোনও বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিতে রাজী নয়। তাহলে সরকার তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করল কেন? কেন বাম সরকার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করল? শুধু তাই নয়, গত ১২.৮.২০০৯ তারিখে সল্ট লেকে নিরীহ ও নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধবাবুর পুলিশ বেধড়ক পেটাল। কারণ তারা নায্য দাবী নিয়ে আন্দোলন করছে। এদের দাবীকে বুদ্ধবাবু, পার্থ দে-রা কি অন্যায় বলে মনে করেন? আজ যে সব ছাত্র-ছাত্রী পুলিশী নিগ্রহের শিকার হচ্ছে, তারা বুদ্ধবাবুদের পাপের ফল এবং বাম সরকারের জঘণ্য নীতির পরিণতি। আশ্চর্যের বিষয় বিরোধীদের ভূমিকা সদর্থক নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ও মমতা বন্দোপাধ্যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সময়ে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাতে কাজের কাজ কিছুই হলো না। যে ভুলে ট্রন্তও ডুবেছে, সেই একই ভুলে কংগ্রেস ও বন্তট্রও ডুববে যদি তারা কিছু না করেন। বিজেপি নেতৃত্বকে এই বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে। *---অধ্যাপক আশিস রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া-৩।*

ডোডো পাখির মতোই হিন্দু'র বিলুপ্তি

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবী থেকে ডোডো পাখির মতো হিন্দুর বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ডোডো মানে বোকা। ডোডো পাখি অর্থাৎ বোকা পাখি। ভারত মহাসাগরে মরিশাস দ্বীপ ছিল এদের বাসভূমি। এদের বাসভূমিতে খাদ্যের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু পরিশ্রম করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাই খেয়ে খেয়ে এদের শরীরের ওজন ৩০-৩৫ কেজি মতন হয়ে গিয়েছিল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম, বা শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিশ্রম, কোনওটাই এদের দরকার হতো না। নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত জীবন। তাই এরা উড়তে পারত না ভারি শরীরের জন্য। ওড়ার প্রয়োজনও হত না। আনুমানিক পাঁচশো বছর আগে স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ নাবিকেরা বাণিজ্য করতে যাওয়ার সময় মরিশাস-এ থামত বিশ্রাম নিতে। সে সময় ডোডো পাখিগুলি অবাক বিস্ময়ে নাবিকদের দেখত। নির্ভয়ে চারপাশে এসে ভিড় করত, নবাগতদের মতো কোনও কিছু তারা আগে কোনও দিনও দেখেনি। তাদের কোনও ভয়ও ছিল না যে তাদের কোনও ক্ষতি হতে পারে। স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ নাবিকরা কয়েকটা ডোডো লাঠি দিয়ে মারল, কয়েকটা ধরল তারপর রান্না করে খেয়ে দেখল সুস্বাদু মাংস। তখন থেকে ডোডো নিধন শুরু হয়। যাওয়া আসার পথে নাবিকরা দ্বীপে নামত, ডোডো ধরত (অনর্থক সময় খরচ করত না)। কিছু রান্না করে খেত, আর কিছু পথের খাবার হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যেত। এতেও ডোডোগুলোর কোনও শিক্ষা হল না। নবাগতদের দেখলেই তারা কাছে এসে নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করত। শত্রু চিনল না, শত্রু দেখলে পালাতে হয় বা পাল্টা আক্রমণ করতে হয় সেটা শিখল না। ফলে পৃথিবী ডোডো পাখি শূন্য হয়ে গেল।

ভারতের হিন্দুরাও অনেকটা ডোডো

জনমত

পাখির মতো। শত্রু চিনতে পারে না। শত্রুর শত্রুতা দেখেও, নির্বিকার থাকে। শত্রুর নৃশংস অত্যাচার, নির্যাতন দেখেও নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ জীবন-যাপন করে। ভয় পায় না, সাবধানতা অবলম্বন করা অপ্রয়োজনীয় মনে করে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে "হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই" করে থাকে। ফলে পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় শূন্য। বাংলাদেশে তলানিতে এসে ঠেকেছে হিন্দুর সংখ্যা। আর ভারতে? ৭১১ খৃঃ মহঃবিন কাসিমের ভারত আক্রমণ থেকে শুরু করে সুলতান মামুদ, মহঃ ঘুরী, তৈমুর লঙ, বাবর, নাদির শাহ, আহমেদ শাহ আবদালী প্রভৃতি ভারত আক্রমণকারী এবং ভারতের শাসন ক্ষমতায় থাকা বাদশাহ্ সুলতানরা ভারতে হিন্দুদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা করে, হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে, হিন্দু রমণীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করে পরিশেষে আরবের দাস বাজারে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করে, তা থেকে কোনও শিক্ষাই নেয়নি হিন্দুরা। শুধুমাত্র তাই নয়, ১৯৪৬ সালে Direct Action-এর নামে কলকাতা-নোয়াখালি এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে ৬-৭ লক্ষ হিন্দু ও শিখ যে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল মুসলমানরা এবং তারপর পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা যে ক্রমাগত অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন, নিপীড়নের শিকার হয়ে চলেছে, বাড়ি-ঘর লুট এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করে, যুবতী মেয়েদের বলপূর্বক হরণ করে, জোর করে ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে গিয়েও হিন্দুদের সচেতন করতে পারেনি। কে শত্রু আর কে মিত্র চিনতে হিন্দুরা ভীত হয়েছে। কিন্তু পরে সব ভুলে গিয়ে "হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই" করে একত্রে বাস করতে চাইছে, সম্প্রীতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে সদ্ভাব রাখতে চাইছে। এই সুযোগে মুসলমানরা

(এরপর ১৩ পাতায়)

পরম্পরা

ভারতের সুপ্রাচীন কার্তিক মন্দির

বৈদেহীনন্দন রায়

স্কন্দস্বামী তথা দেবসেনাপতি কার্তিকের জন্ম ও কর্ম ভূ-ভারতে সবাই জানেন। দুর্দ্ধর্ষ দানব তারকাসুরের নিধনের জন্য শিবতেজে জন্ম তাঁর। ঠিক বিজ্ঞানের কার্যকারণ সম্পর্কের মতো। ভগবান ত্রিপুরারির তেজপুঞ্জ হতে যে তেজপাত হয়, তা প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নির্দেশে অগ্নি সেই তেজকে ধারণ করেন। অগ্নিতে হব্যদানকালে দেবতারা সেই অগ্নির দগ্ধ হব্য ধারণ করে পীড়িত হন। অবশেষে তাঁরা মহাদেবের নির্দেশে গঙ্গায় তা বিসর্জন করেন। শিব অগ্নিকে বর দিয়েছিলেন মাঘের শীতে যাঁরা ক্লিষ্ট হবেন, তাঁদের শরীরে তেজ নিক্ষেপ করলে সমস্যার সমাধান হবে।

এসময় প্রভাতে অরুন্ধতীসহ ঋষি পত্নীগণ সরোবরে স্নানের জন্য এলে অগ্নি জলাশয়ের কাছে আবির্ভূত হলেন। ঋষি পত্নীরা স্নানের পর শৈত্যতাড়নে সেই অগ্নির কাছে যান তাপ নেওয়ার জন্য। সতী অরুন্ধতীর বারণ সত্ত্বেও। সেই সুযোগে, শিব তেজ অগ্নি হতে পরমাণুর আকারে ঋষি পত্নী কৃত্তিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো। ঋষিরা ধ্যানে তা জানতে পেরে পত্নীদের নির্বাসিত করলেন হিমালয়ে, দ্বিচারিণী হওয়ার কারণে। ক্ষোভে-দুঃখে ঋষিজায়ারা উক্ত তেজ হিমালয় বক্ষে বিসর্জন দিলে, সেই মহাতেজ গঙ্গাবাহিত হয়ে সুরধনীতে অবস্থান করতে থাকে। গঙ্গাগর্ভেই উক্ত তেজ হতে জন্ম নেয় ষড়ানন এক তেজকলেবর বালক। ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন ওই বালক শিবপুত্র। গঙ্গাতীরে জন্ম নিয়েছে কৃত্তিকাদের দেহনিঃসৃত হয়ে। নাম তাঁর কার্তিকেয়। ওঁর দ্বারা তোমাদের দানবভীতি দূর হবে। দেবতারা সেই ষড়ানন বালককে শিব-শিবানীর হাতে অর্পণ করলেন।

আবির্ভাব কালে কুমার অর্থাৎ কার্তিকের যে বিবরণ স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়, তা হল---"সুমুখং সুশ্রিয়া যুক্তং সুনসং, সুস্মিতেক্ষণম্।" অর্থাৎ তিনি অন্দিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী সম্পন্ন, শ্রীমান, সুস্মিত নেত্রদ্বয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর।

এইরূপই ঠিক ফুটে উঠেছে কেরলের হরিপাদ মন্দিরের সুপ্রাচীন বিগ্রহ সুব্রহ্মণ্য স্বামী তথা দেবসেনাপতি কার্তিকের অঙ্গ বিভায়। হরিপাদ কেরলের পৌরাণিক স্থান। প্রাচীন অঞ্চল পরিচিতি 'অরিপত্তু' অর্থাৎ ধান উৎপাদক ক্ষেত্র। প্রাচীন সাহিত্য অবশ্য এস্থানকে 'হরিগীতাপুরম' হিসেবে অভিহিত করেছে। অবস্থান ৪৭নং জাতীয় সড়কের তিরঅনন্তপুরম থেকে কোচিন যাওয়ার মধ্যপথে। জাতীয় সড়ক থেকেই দেখা যায় এই ৩৫০০ বছরের মন্দিরকে।

হরিপাদের সুব্রহ্মণ্য ভগবান যে জাগ্রত ও ভগবান পরশুরাম পূজিত, এতো আজও ঘুরে বেড়ায় দাক্ষিণাত্যবাসীর মুখে মুখে। বিগ্রহের প্রাচীনত্ব নিয়ে ২০ জুন ১৯৯৬ এক 'দেবপ্রশ্নম' বা দেবজ্যোতিষ গণনায় প্রমাণিত হয় উক্ত তথ্য। উল্লেখ্য, উক্ত বিষয়টি প্রত্ন জ্যোতিষের একটি দিক।

হরিপাদে সুব্রহ্মণ্য মন্দির

বর্তমান সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দিরটি তৈরি বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে। এক বিধবংসী আগুনে পুরোনো মন্দিরের তিন চতুর্থাংশ ধবংসের পর। দেশময় অঞ্চলটি ছিল মহারাজ মুলম তিরুমল রামবর্মার রাজ্যভুক্ত। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার সাহায্যে গড়ে ওঠে বর্তমান নয়নাভিরাম দেবালয়। স্থপতি ছিলেন প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী এড়াভনাবাদন। স্থাপত্যবিদ্যায় কিংবদন্তি পুরুষ দক্ষিণ ভারতে। মন্দির তিনি তৈরি করেন নির্ধারিত সময়ের বহু আগে।

মন্দির যে অতি প্রাচীন তার নিদর্শন পাওয়া যায় বহু প্রাচীন সাহিত্যে, উক্ত দেবালয় সম্পর্কিত আলোচনায়। এদের মধ্যে 'ময়ূর সন্দেশম্' বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

মন্দিরাধিপতি সুব্রহ্মণ্য বা কুমারস্বামী যে সুপ্রাচীন ও বিষ্ণু অবতার ভগবান পরশুরাম পূজিত, দক্ষিণের সমস্ত মানুষ বিশেষত কেরলবাসীর অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। কারণ বিগ্রহের প্রাপ্তি। জনশ্রুতি হলো প্রাচীন মন্দির আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নতুন মন্দির তৈরির অন্তিম পর্যায়ে এলাকায় প্রতিটি মানুষ স্বপ্নে নির্দেশ পান কোন্ মূর্তি মন্দিরে অভিষিক্ত হবে। 'দেবপ্রশ্নম' হয়। জ্যোতিষীরা বলেন, চতুর্বাহু সমন্বিত পুরোনো সুব্রহ্মণ্য স্বামীর বিগ্রহই অভিষিক্ত হবে, যা কয়ামকুলম হ্রদের জলে শায়িত। সম্ভবত পুরোনো মন্দির আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে নাম্বুদ্রিপুরোহিতরা ভগ্নমন্দিরে দেবতাকে না রেখে শাস্ত্রীয় বিধি 'জলশয়ান' রীতি অনুসারে সরোবরের জলে শায়িত রাখেন। জ্যোতিষীদের প্রদত্ত নিদান মেনে স্থানীয় লোকেরা পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করে সেই অনিন্দ্যসুন্দর প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার করেন এবং মালায়লী মকর মাসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) সুব্রহ্মণ্য স্বামীর বিগ্রহ মহাসমারোহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ প্রাপ্তিকে ঘিরে অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে যে আনন্দ-উদ্দীপনা সঞ্চার হয়, তার প্রতিফলন ঘটে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ মাঘ মাসে, পইপড় নদীতে নৌ-বাইচ প্রতিযোগিতায়। যা আজ এলাকায় জাতীয় ক্রীড়া বলে চিহ্নিত।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, বাংলায় কার্তিক পূজার মানসিকতা ও গতি যে নিম্নপর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়---যিনি নগরনটী ও পুরুষ সন্তানকামীদের উপাস্য দেবতা হয়ে গেছেন, তুলনায় দক্ষিণ ভারতে ভগবান কার্তিকের মর্যাদা তুঙ্গে। এই জন্যই মনে হয় বাঙালী আজ বীর্যহীন, মন্দ-ধীসম্পন্ন জাতিতে পর্যবসিত।

শ্রীচৈতন্য পরিকর গদাধর পণ্ডিত

নারদীয় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী আছে---

দ্বিবিজ্যা ভুবি জয়ধবং ভক্তরূপিনঃ
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ
অহম্ এব দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা।

অর্থাৎ---নারদ, আমি কলিযুগে শচীগর্ভে অবতীর্ণ হয়ে ঘোর তমসাচ্ছন্ন সদাচার বর্জিত সর্বলোকের উদ্ধার করব। হে দেবগণ, আপনাদের ভক্তরূপে সর্বদা লোকরক্ষা করব।

এর ফলে মহাবিষ্ণুর অবতাররূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, ঠাকুর হরিদাস ব্রহ্মার অবতাররূপে, নারদের অবতাররূপে শ্রীবাস পণ্ডিত, রাধিকাভাবে ভাবিত হয়ে গদাধর পণ্ডিত, বৃষভানুরূপে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি---এরূপ অজস্র গৌরভক্তগণ দেবাজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

গদাধর পণ্ডিত নিজে পঞ্চ তত্ত্বের এক অবতার---স্বয়ং রাধাশক্তি, পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস তিনজনই পুরুষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করে গেছেন। কিন্তু গদাধরের গৌরপ্রীতির একটা বিশেষত্ব ছিল। তিনি সর্বদা শ্রীচৈতন্যদেবের বামপার্শ্বে থাকতেন। শ্রীচৈতন্যদেব যা বলতেন তাই করতেন, সর্বদা শ্রীচৈতন্যসেবায় জীবন-মন সমর্পিত। এই ভাবটিও তাঁর রাধাভাবের একটি অভিব্যক্তি।

১৪৮৭ খৃস্টাব্দে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীমাধব মিশ্র, মাতার নাম শ্রীমতী রত্নাবতী দেবী। তাঁদের দুই পুত্র। বাণীনাথ এবং গদাধর। গদাধর ছিলেন চিরকুমার। ১২ বছর পর্যন্ত তাঁরা ঢাকা জেলার বেলেটি গ্রামে ছিলেন। পরে শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস পরিবর্তন করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন চট্টগ্রামের জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়। ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন শ্রীমতী রাধারানীর পিতা বৃষভানু। তিনি গৌরলীলায় আকৃষ্ট হয়ে চট্টগ্রামের বাস পরিত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্যপার্ষদ মুকুন্দ দাস ছিলেন তাঁরই গ্রামের বাসিন্দা। বিদ্যানিধি মহাশয় বিলাসবহুল জীবন কাটাতেন। সর্বদা রাজবেশ, স্বর্ণপালঙ্কে উপবেশন, তাম্রকূট সেবন, স্বর্ণ গড়গড়ায়, সুবর্ণপাত্রে জল পান, দাস-দাসীর পরিচর্যা ইত্যাদি বাহ্যিক রূপে তাঁকে মনে হত অত্যন্ত ভোগী এবং বিলাসী। কিন্তু মুকুন্দ ঠিকই জানতেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাহ্যিক রূপ যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন পরম ভক্ত। একদিন মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় করিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী গদাধর ভোগ বিলাসের মর্ম কিছুই বোঝেন না বা বুঝতেও চান না, তাই তিনি মনে মনে একটু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, এ আবার কেমন ভক্ত! যাঁর আকর্ষণ ভোগ বিলাস আর ঐশ্বর্যের মধ্যে, তিনি কি কখনও ভক্ত হতে পারেন! মুকুন্দ তাঁকে কেন নিয়ে এলেন এবং গদাধর পণ্ডিতের মনে বিদ্যানিধি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা ভাবের সৃষ্টি হলো। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, কতক্ষণে সেই স্থান ত্যাগ করেন।

মুকুন্দ সবই বুঝতে পারছেন এবং তখন তিনি বিদ্যানিধির মাহাত্ম্য প্রকাশ করার জন্য হঠাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের পূতনামোক্ষণের শ্লোকটি পাঠ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রাপ্তি। ক্ষণিকের মধ্যে বিদ্যানিধি মহাশয় সংজ্ঞাহীন হয়ে ভাবান্তর হলো এবং সর্বাঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হলো। এই দৃশ্য দেখে গদাধর পণ্ডিতের বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন এতক্ষণ তিনি যাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছিলেন, তিনি তো পরম ভক্ত। অজ্ঞানতাবশত তিনি কি পাপ করে বসলেন এবং এর প্রায়শ্চিত্ত কীরূপে হবে এই অনুশোচনায় তিনি মরমে মরে গেলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে গিয়ে আদ্যোপান্ত সব বললেন এবং তার বিধান প্রার্থনা করলেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কীরূপে?

শ্রীচৈতন্যদেব-গদাধরকে বললেন, তাঁর কোনও অপরাধ হবে না। কারণ তিনি অনুতপ্ত। কোনও অপরাধের পর মানুষ যদি অনুতাপনলে দগ্ধ হয়, তখনই এই অপরাধের এক বৃহৎ অংশ লাঘব হয়ে যায়---এই কথা বলার পর তিনি বললেন--গদাধর পণ্ডিত যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেন, তবে তা হবে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট সম্মান প্রদর্শন। এইরূপ ঘটনার মধ্য দিয়ে গুরু বরণ করেছিলেন গদাধর পণ্ডিত। তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রীমদ্ভাগবদ পাঠ। তিনি প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভাগবত পাঠ করে শুনাতেন এবং উভয়েই অশ্রু ধারায় ভেসে যেতেন।

গদাধর পণ্ডিত শ্রীধাম নীলাচলে বাসকালে টোটা গোপীনাথ বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আজও বর্তমান। এই গোপীনাথ ছিলেন গদাধরের প্রাণ ও সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা। জনশ্রুতি আছে---এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে বিরহ-অনলে জর্জরিত গদাধর আর তাঁর সেবা বা শৃঙ্গার সুষ্ঠুভাবে করতে পারতেন না বলে এই শ্রীবিগ্রহ তাঁর ভক্তের কষ্টকে লাঘব করবার জন্য পক্ষাসন করে উপবিষ্ট হন যা আজও বর্তমান। প্রকৃত ভক্তের নিকট যে তিনি চির বিক্রিত এবং ভক্তধীন ভগবান---গদাধর পণ্ডিত তাঁর সেবার মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন।

শাস্ত্রমতে, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দর মিলিত তনু। সেই মিলিত তনুকে গদাধর আজীবন শ্রীরাধিকারূপে তাকে পরিচর্যা করে গিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা সংগোপনে একবছর কালের মধ্যেই বিরহজ্বালা সহ্য করতে না পেরে অপ্রকট হন তিনি। লীলা সংবরণ করেন ১৫৩৪ খৃস্টাব্দে। এই হিসাবে তিনি প্রকট ছিলেন ৪৭ বছর।

পঞ্চ তত্ত্বের কারও কোনও দেহসমাধি নাই। কোথায় যে কীভাবে লীন হয়ে গিয়েছেন তার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাঁর যখন ইচ্ছে তিনি তখন লীলা সংবরণ করেছেন। গদাধর পণ্ডিতেরও কোনও দেহসমাধি নাই। এই ঘটনাও পণ্ডিত গদাধরের ভগদ্বত্তার এবং রাধাশক্তির বিশেষ পরিচায়ক।

ফিরে দেখা একটি জীবন — নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দিরা রায়

স্বর্ণযুগ বলতে আমাদের সমাজে যে সময়টাকে চিহ্নিত করা হয়; সে সময়কার বিশিষ্ট এক সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন স্বনামখ্যাত, যিনি আজ সকলের আড়ালে। শুধু সঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই নয়, কবিত্ব শক্তির স্ফূরণ ঘটেছিল তাঁর প্রকাশিত কবিতার গ্রন্থে। এছাড়া সাংগঠনিক দক্ষতায় গড়ে তুলেছিলেন এক মহিলা সমিতি। তিনি হলেন নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বয়সের ভার আর শারীরিক অসুস্থতায় সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। স্মৃতি রোমন্থনে উঠে এল তাঁর জীবনের বিশেষ দিনগুলোর কথা।

চারু অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। এই বাড়িতে তাঁর জীবনের বেশির ভাগটাই কেটেছে। পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যে পুরুষের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন, তিনিও সর্বজন প্রিয় বড় পর্দার বিশিষ্ট কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। কীভাবে এই বিবাহ বন্ধন হয় — এ ব্যাপারে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

''আমি ছোটবেলা থেকেই যে পরিবেশে বেড়ে উঠি, সেখানে গানের চর্চা ছিল। আমার বাবা ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা স্তোত্র পাঠ করতেন। সেই সুর শুনতে শুনতে গান সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে। তখন আমাদের বাবার বাড়ির পাড়ায় থাকতেন অক্ষয় কুমার নন্দী, বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্করের বাবা। তিনি আমার গান শুনে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে যান। বলেন, ভায়া, এই মেয়েটিকে তোমায় গান শেখাতে হবে। সেই শুরু।

সেই সময়ে ওনার বাড়িতে সন্ধ্যের পর শিল্পী বন্ধুরা আসত, গালগল্প করতে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসতেন। হঠাৎ কিছুদিন পর আমার বাবার কাছে সিদ্ধেশ্বরবাবু জানালেন, আপনার মেয়ের বিয়ে দিন, আমার হাতে ভালো ছেলে আছে। আমার বাবা তখন তো রাজি হলেন না, বয়সও কম ছিল, ১৫ বছর। আবার কিছুদিন পর ছেলের বাড়ি থেকে চাপ দেওয়ায় বাবা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ততদিনে আমার ১৬ বছর সবে হল। বিয়ের ব্যাপারটাও খুবই মনে রাখার মতো। তখন কলকাতায় রাজনৈতিক কারণে খুবই গন্ডগোল চলছিল। চারদিকে কার্ফু, ব্ল্যাক আউট। তারই মধ্যে একটা নতুন লাল সিল্কের শাড়ি পরে কোনও রকমে অল্প আলোয় ওনার সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হল। তখনও কিন্তু উনি অভিনয় জগতে

নীলিমা দেবী

আসেননি। তিনি ছিলেন চাকুরিজীবী।''

খুব ছোট বয়স থেকে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, আধুনিক ধ্রুপদ, ধামার শিখেছিলেন, আর তাঁরই সহোদর রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে কীর্তন ও ঠুমরির তালিম লেন। ওই বয়সে সিদ্ধেশ্বরবাবু নিজেই গানের কম্পিটিশনে নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন। তাতে সমস্ত বিভাগেই প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন।

নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গানের রেকর্ড প্রকাশ পায় ১৯৪৫-এ। সেই রেকর্ড 'নীলিমা'র পরিবর্তে প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় নামে। ৪৫ থেকে গত বছর পর্যন্ত আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। এখনও ডাকে কিন্তু যেতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। স্মৃতি রোমন্থনকালে উঠে এল তাঁর সঙ্গীত জীবনের কথা। ''বিয়ের পর বাড়িতে বৃদ্ধা শাশুড়ি ছিলেন। তাঁকে দেখভাল করার দায়িত্ব আমার ছিল। পরে দুটি পুত্র ও এক কন্যাকে মানুষ করার জন্য দীর্ঘদিন সঙ্গীত চর্চা করতে পারিনি। তবে আমার আগ্রহ ছিল অদম্য। তাই, বিয়ের চৌদ্দ বছর পর স্কুল ফাইনাল পাশ করি। ফোর্থ সাবজেক্ট ছিল গান। সেই সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষাও শুরু হল। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই মনোজেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে কোর্সের গান শিখে 'সঙ্গীত প্রভাকর' উপাধি লাভ করি সম্মানের সঙ্গে। এই সময়ে সে সময়কার বিখ্যাত সুরকার ও গীতিকারদের গানে গান করতে থাকি। নির্মলেন্দু চৌধুরীর সঙ্গে অনেকগুলি পদ্য গীতির রেকর্ডও করেছি।''

তখনকার স্বনামখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে গান করেছেন তিনি। যেসব বিখ্যাত সুরকারদের সুরে রেকর্ড করেছেন, তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল — সুধীন দাশগুপ্তর সুরে আধুনিক গান, অভিজিৎ ব্যানার্জির সুরে ছড়ার গান। মিন্টু দাশগুপ্ত, ভূপেন হাজারিকা, শ্যামল মিত্র, সুরেন চক্রবর্তী। রত্নেশ্বর মুখার্জির সুরে কীর্তন। এছাড়াও রজনীকান্ত সেনের গান রেকর্ড করেছেন শৈলেন মুখার্জির সঙ্গে। সঙ্গীতের সব রকম স্তরে বিচরণ থাকলেও, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম 'কীর্তনীয়া' হিসাবে পরিচিত। পশ্চিমবাংলায় 'মহাকীর্তন সম্মেলন'-এ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন একমাত্র নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। নজরুল গীতিতেও সমান পারদর্শী। নজরুলের জন্মদিনে নিয়ম করে প্রতি বছর সকালবেলা বাড়ি গিয়ে গান শুনিয়ে আসতেন। গান শুনে নজরুলের মধ্যে একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠত। যেখানেই গান করতেন সেখানেই নজরুলের একটা গান উনি গাইতেনই। সেটি হল 'দূরের বন্ধু আছে আমার গানের ওপারে।' প্রসঙ্গত জানানো দরকার যে, ৫ আগস্ট '০৯ ঝুলন পূর্ণিমার দিন 'নব অগ্নিবীণা' সংস্থা নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নজরুল গীতির জন্য সম্বর্ধনা জানায়। সেদিনও সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে এই গানটির দু'লাইন গেয়ে শোনালেন সুরেলা কণ্ঠে, সম্পূর্ণ বাদ্যযন্ত্র না নিয়েই।

শুধু বাংলায় নয়, বম্বে থেকে সিনেমায় প্লে-ব্যাক করেছেন 'বন্দিশ' ছবিতে। বাংলা ছবিতে প্রথম প্লে-ব্যাক সুশীল মজুমদারের 'সর্বহারা' ছবিতে। এরপর বহু ছবিতে নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন। তার কয়েকটি হল — 'মনের ময়ূর', 'অদৃশ্য মানুষ', 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে', 'কাঞ্চন মূল্য', 'আম্রপালি', 'বউ ঠাকুরানীর হাট', 'মহাতীর্থ কালীঘাট।' শেষের দিকে অনুষ্ঠান করতে বাইরে যেতেন না। তবে ১ লা বৈশাখ, নববর্ষের দিনে 'বসুশ্রী' প্রেক্ষাগৃহে সকালের অনুষ্ঠানে নিয়মিত গাইতেন। নেতাজী ইনডোরে প্রতি বছর নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে নিয়মিত যেতেন। বিদেশেও গেছেন গানের অনুষ্ঠান করতে ভানু বাবু, শ্যামল মিত্র ও গায়ত্রী বসুর সঙ্গে। আমেরিকা, কানাডায় সাত/আট জায়গায় অনুষ্ঠান করে প্রশংসিত হয়েছেন।

শুধু নিজে শিখে বা গান করে ক্ষান্ত হননি, নিজের বাড়িতে ছোটদের সঙ্গীত শিক্ষার জন্য 'সঙ্গীতশ্রী' নামে একটি স্কুল খুলেছিলেন। শুধু গান নয়, পরে নাচ, গীটার শেখানো হত। কিন্তু অপ্রিয় কিছু কারণে স্কুল বন্ধ করে দেন। এরপরও কিন্তু বসে থাকেননি। পাড়ার মহিলাদের অনুরোধে নিজের বাড়িতেই 'চারু অ্যাভিনিউ মহিলা সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠন সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'পাড়ার মহিলারা ছাড়াও একজন সজ্জন বিদগ্ধজন দেবপ্রসন্ন সেন আমায় বিশেষ অনুরোধ করায় বাধ্য হলাম। দ্বিতীয় বছর থেকে আমি একটানা সম্পাদক ছিলাম। মহিলাদের দিয়ে হাতের কাজের প্রদর্শনী, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, খাবার (হাতের তৈরি) বিক্রি করাতাম। বছরে ছোট বড় সকলকে নিয়ে নাচের অনুষ্ঠান করাতাম। আমিই স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দিতাম। নাটক পরিচালনা করে মহিলাদের দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতাম। বিশিষ্ট অতিথিরা দেখতে আসতেন, প্রশংসাও করতেন। একটা পত্রিকাও প্রকাশ করাতাম। 'প্রথমা' নাম দিয়েছিলাম আমিই, কারণ, এই পত্রিকায় সব ক্ষেত্রেই যে সব মহিলাদের প্রথম স্বীকৃতি লাভ এবং কৃতীদে'র তুলে ধরা ছিল লক্ষ্য। পত্রিকাটি বিদগ্ধ মহলে খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। ২০০৮ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে। সবটাই ছিল আমার পরিকল্পনা। এখন আর শরীরের জন্য দায়িত্ব নিতে পারি না। তবে মহিলা সমিতি চলছে অন্য জায়গায়, আমিও যুক্ত আছি। শুনে ভাল লাগে পত্রিকা না হোক, ওরা দেওয়াল পত্রিকা বার করে।

ভানুবাবু সম্পর্কে ওনার মুখে কিছু শোনার আগ্রহ জানাতে তাঁর সপ্রতিভ জবাব 'আপনারা হয়তো-ওনার প্রকৃত নাম জানেন না। ওনার নাম ছিল 'সাম্যময়'। বাড়িতে অত্যন্ত রাশভারি ছিলেন। উদার, পরোপকারী ছিলেন। তবে কখনও জানতে দিতেন না নেপথ্যে তাঁর উপকারের কথা। আমাদের বিয়ের বছরই ওনার সিনেমায় প্রবেশ। কৌতুক করার দক্ষতা দিয়েই কিছুদিনের মধ্যেই দর্শকের মন জয় করেছিলেন। সংসারের সব দায়িত্ব আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। অভিনয়ের পাশাপাশি চাকরি করতেন। বম্বেতে যাওয়ার পর চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। পরে সিগারেটের ব্যবসা করেছিলেন। স্টুডিওতে টেকনিশিয়ানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। উত্তমকুমারের সঙ্গে দাদা-ভাই-এর সম্পর্ক ছিল। প্রায় শেষের দিকে সিনেমা ছেড়ে যাত্রায় আসেন। ওনার অভিনীত যাত্রা-পালায় আমি অনেক গান লিখে সুর করে দিয়েছি।'

আজ অবসর জীবনে কিছু না করে বসে থাকতে পারেন না। এখনও গান লেখেন, সুরও দেন। ওনার একশোটি কবিতা'র বই বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, শুধু কলম ধরতে ভাল বাসেন না, হাতা-খুন্তি ধরে রান্নায় নতুনত্ব আনতে আজও উৎসাহিত হন। তাই হঠাৎ ইচ্ছে হলে রান্নাঘরে চলে যান।

।। চিত্রকথা ।। গোকুলের শ্রীকৃষ্ণ ।। ২

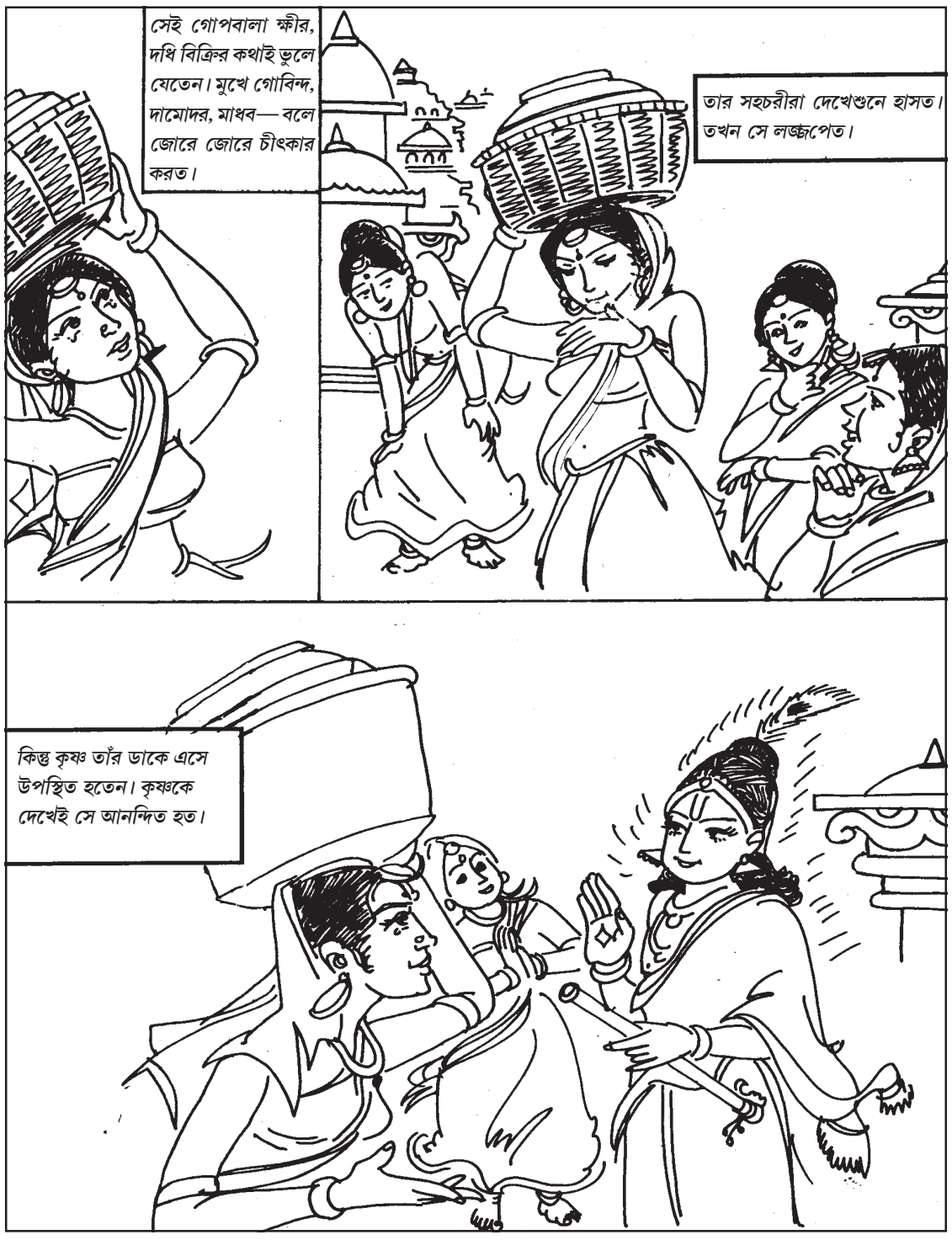

গীতাঞ্জলির শতবর্ষে পদার্পণ ও রবীন্দ্র-ভাবনা

(৮ পাতার পর)

করে। তাই সৃষ্টি হল, 'ভারততীর্থের" মতো কালজয়ী কবিতা (১৯২০)।

রবীন্দ্রনাথের ৫০তম জন্মদিবস উপলক্ষে টাউন হলে তাঁকে দেশবাসীর তরফ থেকে অভিনন্দিত করা হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁকে মহা প্রতিভাধর সর্ববিদ্যা বিশারদ মহামতি রূপে অভিনন্দিত করেন। অবশ্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে "World Poet" বিশ্বকবি (১৯০১) বলেন। মনীষী ব্রজেন শীল বলেন,---রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপে পাঠানো উচিত সেখানকার চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিতির জন্য। কারণ তাঁর মাধ্যমে জগৎ জানতে পারবে পরাধীন ভারতের পরিচয়। শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালের ২৮ মে ইউরোপ যাত্রা করলেন। সঙ্গী পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। আর তিনটি কবিতার বই। নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি। জাহাজে বসে বই তিনটির কবিতাগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করলেন।

১৬ জুন রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছলেন। উঠলেন হোটেলে। শিল্পী রোদেনস্টাইন তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের গৃহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপে ও তাঁর কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনের হাতে তুলে দেন তাঁর ইংরাজিতে অনুবাদ করা কবিতাগুলি। রোদেনস্টাইন সেগুলি পড়ে গভীরভাবে অভিভূত হন। সেগুলি টাইপ করে কবি ইয়েটস, স্টপফুট ব্রুক ও ব্রার্ডসের কাছে পাঠান। এবং তাঁর গৃহে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের আয়োজন করে নিমন্ত্রণ করেন। ---মে সিনক্লেয়ার, ইউলিন আঙ্গার হিল, আনেস্ট রীজ, চার্লস ট্রডেনিয়ান, এজরা পাউন্ড, এ্যালিস মেলিন, হেনরি নেডিনসন প্রমুখ কবি মনীষীদের। অধ্যাপক এনড্রুজের সঙ্গে ওখানেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয়।

কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস---রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি পাঠ করেন। লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিখ্যাত বার্নার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েলস, স্টপ ফোর্ডব্রুক, বার্ট্রান্ড রাসেল, জন গলসওয়ার্দি, স্টার্জ মূর প্রমুখ মনীষীরা।

গুণীজন, সেরা কবি সাহিত্যিকরা স্তব্ধ বিস্ময়ে কবিতা পাঠ শোনেন কিন্তু কোনও মন্তব্য না করে বিদায় নেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুটা হতাশ হন। বেদনা বোধ করেন। কিন্তু পরদিন থেকেই আসতে শুরু করে টেলিগ্রাম আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভরা পত্র। কাব্য সাহিত্যে এমন দার্শনিকতত্ত্ব ভরা গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী অধ্যাত্মিক রসসিক্ত বাণী পূর্বে কেউ শোনায়নি। প্রায় উপযাচক হয়ে তারা ঋষিকবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন,---বিখ্যাত বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস, স্টপফোর্ড ব্রুক, বাট্রান্ড রাসেল, জন গলসওয়ার্দি ও স্টার্জ মূর প্রমুখ নাট্যকার, কবি ঔপন্যাসিক, দার্শনিকবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ ২৭ অক্টোবর ১৯১২ সালে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। এদিকে শিল্পী রোদেনস্টাইন এর প্রযত্নে 'নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলির' ১৬৩টি কবিতা---কবি ইয়েটস-এর ভূমিকাসহ লন্ডনের India Society প্রকাশ করে ১৯১২-র ১লা নভেম্বর। ছাপা হয় মাত্র ৭৫০ কপি। প্রচ্ছদ আঁকেন রোদেনস্টাইন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে ঝড় ওঠে। পণ্ডিত সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা গ্রন্থটিকে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে রায় দেন। গ্রন্থটি Song offerings (গীতাঞ্জলি) নামে মুদ্রিত হয়। এর কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, ভারতে ফেরেন ৪ অক্টোবর ১৯১৩। এদিকে রোদেনস্টাইন ও কবি স্টার্চ মূরের অক্লান্ত প্রযত্নে ও সুপারিশে সুইডিশ নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথের নাম জানতে পারেন। কবির Song offerings গীতাঞ্জলি বিচারকদের বিস্ময়াহত করে। একজন এশিয়াবাসী কবিকে প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রদান। এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে টেলিগ্রামে প্রেরণ করা হয় ১৫ নভেম্বর ১৯১৩। বিচিত্র ব্যাপার যে কবি ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হন। ভেবেছিলেন তিনিই এ বছরের নোবেল পুরস্কার পাবেন। অথবা ইংরাজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি পাবেন। ইয়েটস প্রচার করলেন তিনিই গীতাঞ্জলির অনুবাদক। কবি আর্নেস্ট রীজ ও শিল্পী রোদেনস্টাইন হিসাব করে দেখালেন,---ইংরাজী গীতাঞ্জলির ৯৩টা কবিতার দশ হাজার শব্দের মধ্যে মাত্র ৪৫টি শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন--ইয়েটস। যেমন, you স্থলে thou বা thou এর স্থলে you. Oh-এর জায়গায় O। এ ধরনের তুচ্ছ পরিবর্তনের কোনও গুরুত্বই নেই বলেছেন আর্নেস্ট রীজ ও রোদেনস্টাইন।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটি কলকাতায় পৌঁছলে সারাদেশ আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রভক্ত "ছন্দের যাদুকর" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটা ফিটন গাড়ি ভাড়া করে বালক ভাগ্নেকে নিয়ে সারারাত ধরে কলকাতা পরিভ্রমণ করেন। দিন দশেক পরে ২৩ নভেম্বর কলকাতার শিক্ষিত ভদ্রজন একটা স্পেশাল ট্রেন রিজার্ভ করে বোলপুর পৌঁছান বাংলা ১৩২০ সালের ৭ অগ্রহায়ণ। এঁদের সংখ্যা ছিল পাঁচশো---এঁরা রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে উৎসব হলো। নানা প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায় কবিকে মানপত্র দিলেন। সেদিনকার সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্যে ছিল বাঙালীর অকপট ভক্তি ভালোবাসা। কিন্তু অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আপনাদের অভিনন্দনের পানপাত্রটি ওষ্ঠে ছোঁয়ালাম মাত্র---পান করলাম না।" শান্ত সুন্দর মহতী সভায় যেন বজ্রাঘাত হল। কবির প্রতিভাষণে এমনকিছু কড়া কথা বললেন,---যাতে ভক্ত অভক্ত সকলেই যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু শান্ত, ভদ্র মানুষ কেন এত বিচলিত ক্ষুব্ধ হয়ে অপ্রীতিকর অসৌজন্য মূলক ভাষণ দিলেন ? কারণ, সভার প্রথম সারিতে বসেছিলেন--এক বিশালকায় মানুষ। বিদ্যাসাগর মশায়ের দৌহিত্র বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তিনি সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রচনার অতি কঠোর সমালোচক ছিলেন। অপমানজনক ভাষায় রবীন্দ্র-বিদূষণ করতেন। তাঁর পাশের চেয়ারে ছিলেন ক্ষীণকায় কবি অমরেন্দ্রনাথ রায়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে "পায়রাকবি" নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। এঁদের দেখেই কবির মেজাজ যায় বিগড়ে---এ ছাড়া সেদিনই ইতর ও অসম্মানকর ভাষায় লেখা একটি পত্র পান। তিক্ত মেজাজ নিয়েই কবি সভায় আসেন। তারই ফলশ্রুতি---অপ্রিয় প্রতিভাষণ। তবে সেদিনটা ৭ অগ্রহায়ণ ছিল---তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও প্রিয়তম পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুদিন। কবির হৃদয় ছিল ভারাক্রান্ত। ইংরাজিনবিশরা রটাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী যথেষ্ট আধুনিক নয়---রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অবসান ঘটেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আঁদ্রে জিদের মতো মনীষী ফরাসি ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেছেন। তার ৪০টা সংস্করণ হয়েছে। গীতাঞ্জলি মুগ্ধ-জার্মানী রবীন্দ্রনাথকে "বিশ্বকবি" বলে সম্মান জানিয়েছে। "গীতাঞ্জলি" অনূদিত হয়েছে---রুশ, ডাচ, জার্মান, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, সুইডিশ ভাষায়। আশ্চর্যের কথা আধুনিক হিব্রু বাইব্রিস ভাষায়ও গীতাঞ্জলির অনুবাদ হয়েছে। এদেশের ইংরাজিনবিশ কিন্তু সংস্কৃতি অনভিজ্ঞ অর্ধশিক্ষিত লোকেরা যখন রবীন্দ্রনাথকে "বুর্জোয়া" প্রতিক্রিয়াশীল গজদন্ত মিনারবাসী বলে দূষণ করছে তখন প্রখ্যাত মনীষী অধ্যাপক গিলবার্ট মোয়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য---গীতাঞ্জলির কবি Rabindranath Probably the most famous poet now living in the world (1935). এবছর গীতাঞ্জলি শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। আগামী বছর (১৯১০) গীতাঞ্জলি প্রকাশের শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রো রেলপথের একটি স্টেশনের নাম "গীতাঞ্জলি" রেখে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

নিভৃত প্রাণের দেবতা

(৯ পাতার পর)

এবারের পুজোয় সম্পূর্ণ ভিন্ন মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টে লোপামুদ্রা রবীন্দ্রসঙ্গীতের পুজোর অ্যালবাম 'আনন্দ' নিবেদন করেছিলেন। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল, রবিঠাকুর সারা পৃথিবীর। তিনি সময়োপযোগীও। একই কথা বললেন স্বাগতালক্ষ্মীও— "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুর খুঁজে নিয়েছিলেন ধ্রুপদী সঙ্গীত, পাশ্চাত্য সঙ্গীত, কীর্তন, লোকগীতি, স্তোত্র, দক্ষিণী সঙ্গীতের মধ্যে থেকে।" এ ব্যাপারে শ্রোতাদের ওপর একটা চাপা অভিমান রয়েছে তাঁর। বলছেন— "রবি ঠাকুরকে জানতে হলে, তাঁর পুরো গানের জগতে পাড়ি জমাতে হলে, ওই সব ধরনের গান গাওয়াটাও জরুরি। আমি রবীন্দ্রনাথের বাইরে অন্য কোনও গান গাইলে লোকে যেন তাঁর অকারণ সমালোচনা না করেন।"

সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন— গীতাঞ্জলির শতবর্ষে পদার্পণ নিঃসন্দেহে বিশাল ব্যাপার, কিন্তু দুশো বা তিনশ' কিংবা তারও বেশি কালকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন রবীন্দ্রনাথই থাকবে। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের মতে, "রবীন্দ্রনাথ একটা জীবনে যা করেছেন তা কল্পনার বাইরে। তিনি অতিমানব। তিনি আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁকে খাটো করে দেখাবার চেষ্টা আগেও বহুবার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথ বা বাঙালীর কিছু এসে যায় না।" সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের গীতাঞ্জলির অন্যতম প্রিয় গান— 'আমার মাথা নত করে দাও হে...'। কারণ এই গান ভেতরের উদ্ধত অহং-কে সম্পূর্ণভাবে মুছে দেয়। সাহিত্যিক অমর মিত্রের ব্যাখ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বত। তিনি হিমালয়সদৃশ।" তবে রবিঠাকুরের সমস্ত গান-কবিতা, ছোট গল্প, নাটককে অমর মিত্র অনন্যসাধারণ বললেও সব উপন্যাসকেই সেই পর্যায়ভুক্ত করছেন না। কারণ তাঁর মনে হচ্ছে, "ডাকঘর', 'বিসর্জন'-এর মতো ছোট গল্পকে কেউ কোনওদিন ভুলতে পারবে না। তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় ঔপন্যাসিক বাঙলায় ছিলেন।"

লোপামুদ্রা মিত্রের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে জীবনানন্দ (পড়তে হবে জীবনে আনন্দ)। স্বাগতালক্ষ্মীর কাছে রবিঠাকুর হলেন 'তোমারে জানি নে হে তবু মন তোমারে ধায়'। মনে দাগ কাটার মতোই স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তর বক্তব্য — "মানসিক অবস্থার যে কোনও দিক যেমন — হর্ষ, বিষাদ, ব্যথা-বেদনা সবক'টি দিকে তিনি রয়েছেন, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের মতোই।" আর ইন্দ্রাণী সেনের কাছে গুরুদেব ঈশ্বরের মতোই।

রবিঠাকুর পুঁথিগত বিদ্যার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা বই মিলিয়ে কাজ করছে— এমন দৃশ্যের বরাবরের সমালোচক রবীন্দ্রনাথ। আজকে তিনি থাকলে দূরাভাষে কাজ সারা সাংবাদিকতাকে ঠিক কি চোখে দেখতেন ? ফোনে গীতাঞ্জলির শতবর্ষে পদার্পণ করা নিয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে গুহ দম্পতি (সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ ও তাঁর স্ত্রী রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা ঋতু গুহ) সটান জানিয়ে দেন, ফোনে তাঁরা কিছু বলবেন না। জানতে হলে মুখোমুখি হতে হবে। এটা কি তবে রবিঠাকুরের সাংবাদিকতা-দর্শন ? আরে ! ভাবনাটা তো ঠিকই। কেমনে ভোলা যায়— রবি ঠাকুর যে নিভৃত প্রাণের দেবতা। একলা চলার ঠাকুর।

ডোডো পাখির মতোই

(১০ পাতার পর)

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করছে, শক্তি সঞ্চয় করছে, ভারতে নাশকতামূলক কাজকর্মে জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে। খুন, জখম, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, অপহরণ, ধর্ষণ এখন এদের কাছে জলভাত হয়ে গেছে। শহরে প্রকাশ্যে অপরাধমূলক কাজকর্ম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার থাকে যদি দেখে দুষ্কৃতীরা সবাই 'এক বিশেষ সম্প্রদায়ের'।

এখন আবার নতুন নতুন বাহানা শুরু হয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় স্কুলে সরস্বতী পুজো করা চলবে না। স্কুলে প্রতিদিন দুপুরে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, নামাজ পড়ার জন্য ছুটি দিতে হবে, স্কুলের একটি ঘর মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। মসজিদের সামনে দিয়ে হিন্দুরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, প্রতিমা বিসর্জনে যেতে পারবে না। মুসলিম মহল্লাতে তো বটেই, আশেপাশে কোনও মুসলিম মহল্লা থাকলে ঈদলফেতর বা অন্য কোনও মুসলিম পরবে হিন্দুদের চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো বিস্তার লাভ করছে। এত কিছু দেখা সত্ত্বেও হিন্দুদের আচরণ সেই ডোডো পাখিদের মতই রয়ে গেছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামে-গঞ্জে বা শহরে এতদিন যে ঘটনাগুলি ঘটছিল এখন সেই সমস্ত ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই অপহরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা— কয়েকজন মুসলমান দুষ্কৃতী মোটর সাইকেল করে এসে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া একটি 'টাটা সুমো' থামাতে চেষ্টা করেছিল মেয়ে অপহরণের উদ্দেশ্যে। টাটা সুমোর চালক গাড়ি না থামানোতে গাড়ির সামনে মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে চালককে গাড়ি থামাতে বাধ্য করে। তারপর প্রকাশ্য দিবালোক চালককে গাড়ি না থামানোর অপরাধে গুলি করে হত্যা করে ঘটনাটি মেটিয়াব্রুজ এলাকার। অত্যন্ত আশ্চর্যের সংবাদ মাধ্যমগুলি এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ করে না। করলেও এরা এমনভাবে করে যাতে মূল সংবাদ প্রকাশিত হয় না। পরিস্থিতি যা দাঁড়াচ্ছে তাতে ডোডো পাখির মতোই পৃথিবী থেকে হিন্দুর বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

পরলোকে মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন কোলকাতার পশ্চিম পুটিয়ারীর বহুজন পরিচিত মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (মন্টুবাবু বা মন্টুদা)। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত রোগে আক্রান্ত হলে ৩০-১০-২০০৯ তারিখ সকালে তাঁকে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ৫-১১-২০০৯ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫টা ৫ মিনিটে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বধর্মনিষ্ঠ, হিন্দুত্ববাদী, দেশভক্ত, ন্যায়পরায়ণ ও বিশিষ্ট সজ্জন হিসাবে তিনি এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একমাত্র কন্যা-জামাতা, একমাত্র নাতনী, -নাতজামাই, ভাই-বোনদের এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সংঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়ের বড়দা।

খেলার জগৎ

কমনওয়েলথ গেমসের বর্ণময় শুভ মহরত

।। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। কমনওয়েলথ গেমসের আর এক বছরও বাকি নেই। সামনের বছর ৩-১৪ অক্টোবর দিল্লীতে চলবে কমনওয়েলথ গেমস। ১৯৮২-র দিল্লী এশিয়াডের পর ভারতের মাটিতে সর্ববৃহৎ ক্রীড়াসংস্কৃতি সঙ্ঘ। কলেবরে যা এশিয়াডের থেকে অনেক বড় প্রায় বিশ্বজনীন—সেই কমনওয়েলথ গেমসের শুভ মহরত সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হোল গ্রেট বৃটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজপ্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেস চত্বরে। কমনওয়েলথ গেমসের রীতি অনুযায়ী বৃটেনের রাণী যেহেতু কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সংগঠনের সর্বেসর্বা তাই তার প্রাসাদে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বর্ণময় এই মহরত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল, আইওএ-র কর্ণধার সুরেশ কালমাদি, ক্রীড়ামন্ত্রী এম এস গিল সহ প্রথম ব্যক্তিগত অলিম্পিক সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা, দুই ব্রোঞ্জজয়ী বিজেন্দার ও সুনীলকুমার, ক্রিকেটার কপিলদেব, 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিং, একদা দূরপাল্লার খ্যাতিমান দৌড়বীর গুরুবচন সিং রনধাওয়া, জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক দিলীপ টিরকে। এদের সঙ্গে ছিলেন লণ্ডন অলিম্পিকের অন্যতম প্রধান সংগঠক তথা প্রাক্তন বিশ্ববন্দিত রানার 'লর্ড' সেবাসটিয়ান জো, ডাবল অলিম্পিক সোনা জয়ী ম্যারাথনার কেলি হোমস, ক্রিকেটার মন্টি পানেসর। আর মঞ্চ আলো করে ছিলেন কমনওয়েলথ গেমস ফেডারেশনের 'সুপ্রিমো' মাইক কারনেল। সব মিলিয়ে যেন চাঁদের হাট।

প্রথামাফিক রাণী কমনওয়েলথ গেমসের ব্যাটন তুলে দেন ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে। তার হাত থেকে ব্যাটন নেন কালমাদি ও গিল। এরপর সমবেত ক্রীড়াবিদ ও অ্যাথলিটরা ওই ব্যাটন নিয়ে প্যালেস স্কোয়ার প্রদক্ষিণ করেন। সবশেষে দিলীপ টিরকে ও গুরবচন সিং রনধাওয়া ব্যাটন নিয়ে 'কমনওয়েলথ' গেমসের সুসজ্জিত ট্যাবলো গাড়িতে উঠে পড়েন। এরপর ওই ব্যাটন প্রায় ৭০টি দেশ ঘুরবে। প্রায় দেড় লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ব্যাটন কমনওয়েলথ গেমসের বেশ কিছুদিন আগে ভারতে পৌঁছবে। প্রতি দেশে অন্তত একশো জন ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক কর্মী ব্যাটন নিয়ে দৌড়বেন। ভারতে আসার পর প্রতি রাজ্যের রাজধানী শহরে ব্যাটন নিয়ে আসতে হবে ও সংক্ষিপ্ত কিছু মনোজ্ঞ সেমিনারের মাধ্যমে কমনওয়েলথ গেমসের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য তুলে ধরা হবে দেশবাসীর কাছে।

অলিম্পিয়াডের চিরন্তন জীবনতত্ত্বের আঁধারে জন্ম হয়েছিল কমনওয়েলথ গেমসের। আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব সূর্য অস্তমিত হওয়ার ক্রান্তি মুহূর্তে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে থাকা দেশগুলিকে নিয়ে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লগ্নে এক চিরস্থায়ী অঙ্গীকারের খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। তা হলো এইসব দেশগুলির মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন ও সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির পক্ষে সব ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। আর তা করতে হলে এক সার্বজনীন ক্রীড়া মহোৎসবের আয়োজন করতে হবে প্রতি চারবছর অন্তর।

রাণীর হাত থেকে ব্যাটন নিচ্ছেন রাষ্ট্রপতি।

অলিম্পিয়াডে যেমন ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, এখানে অবশ্য তার চরিত্র ও প্রজাতির খানিকটা অদলবদল করে শুধুমাত্র ক্রীড়া ও শরীরচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে---এই মর্মে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫৮-এ প্রথম কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে। তারপর থেকে প্রতি চারবছর অন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে কমনওয়েলথ গেমস। ভারত কমনওয়েলথ ফেডারেশনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে প্রতিটি কূটনৈতিক সম্মেলন ও ক্রীড়াউৎসবে অংশগ্রহণ করে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। তৎসত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর লেগে গেল এদেশের বুকে কমনওয়েলথ গেমস নিয়ে আসতে। আসলে এদেশের কোনও সরকার ও মিডিয়া অলিম্পিক বা ওই ধরনের গেমসের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। এশিয়াডের সময়ে রাজীব গান্ধী জীবিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিক হিসেবে ব্যর্থ হতে পারেন কিন্তু আদ্যন্ত 'স্পোর্টিং স্পিরিট' সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। নিজে পাইলট হওয়ার জন্য খেলা ও 'অ্যাডভেঞ্চারের' প্রতি সহজাত আকর্ষণ ছিল। বুঝেছিলেন শক্তিশালী জাতি গঠন করতে হলে খেলাকে জীবন ও সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। মূলত তার সদিচ্ছা ও উদ্যোগেই ভারতে দ্বিতীয়বারের জন্য এশিয়াড আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল। আর তার ফলে দেশে ক্রীড়া আন্দোলনে জোয়ার আসে ও দিল্লী শহরের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হয়।

তারপর তিনটি দশক অতিক্রান্ত, এশিয়াডের সুফল ভারতবাসী সেভাবে ভোগ করতে পারল না। এদেশের ক্রীড়া সংগঠক, সরকার ও মিডিয়ার অপরিণামদর্শী কাজকর্মের জন্য। অলিম্পিয়াড কবে হবে তা ভগবানও জানে না, কিন্তু কমনওয়েলথ গেমস যাতে সবদিক থেকে সফল হয় তার জন্য সর্বাত্মক কর্মসংস্কৃতি কোথায়? একবছরও বাকি নেই, এখনও অধিকাংশ সেন্টারের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ মাঝপথে আটকে আছে। গয়ংগচ্ছভাবে কাজ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে সতর্কবার্তা দিয়েছেন কমনওয়েলথের প্রধান মাইক কারনেল। ইউপিএ নেতৃবর্গ ও আইওএ কর্তাদের সঙ্গে দফার দফায় বৈঠক করে সমাধান সূত্র বের করেছেন তিনি। তার তৎপরতায় দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন গেমস সংগঠকরা। আশা করা যায়, ঠিক সময়ে সবকাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ও এশিয়াডের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ কমনওয়েলথ গেমস করে অলিম্পিকের দাবীদার হবে ভারত।

ভারতের মতো গরীব দেশে এই রাজকীয় আয়োজন এবং অত্যাচারী বৃটিশের পদলেহন করে কমনওয়েলথের সদস্য থাকার যৌক্তিকতা আদৌ আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।

শব্দরূপ - ৫২৫

দেবাশীষ দত্ত

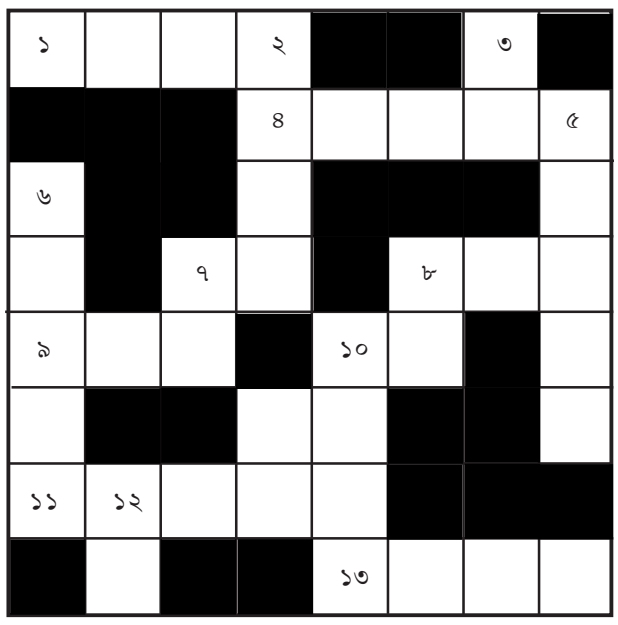

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. ঋষি গৌতমের পুত্র, প্রথম ঘরে হ্যাঁ বিপরীত, দুয়ে-চারে ঊর্ধ্বমুখে শয়ন, ৪. ইঙ্গ শব্দে তাপমান যন্ত্র, ৭. যত—তত পথ ৮. নামগান, রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান, ৯. ভাগবতে বর্ণিত যমুনা নদীর গর্ভে বাসকারী নাগবিশেষ, ১০. নুপুর জাতীয় অলংকার বিশেষ, ১১. প্রতিশব্দে চাঁদ, প্রথম তিনে রাত্রি, শেষ দুয়ে খাজনা, ১৩. মুনিবিশেষ বা তৎপ্রণীত পুরাণবিশেষ।

উপর-নীচ ঃ ২. অন্য নামে বুদ্ধ দেব, আগা-গোড়া অব্যয়ে বিশেষণে সেই পরিমাণ, ৩. তৎসম শব্দে বিশেষণে বেঁটে, ৫. সূর্যের কন্যা, যমুনা, ৬. দেবতা-বিদ্বেষী এক অসুর, প্রথম দুয়ে রজ্জু, তিনে-পাঁচে ফ্যাসাদ, ৭. পৌরাণিক দানব-শিল্পীবিশেষ, ৮. হুড়কো, খিল, ১০. কার্তবীর্যার্জুনের স্ত্রী, শেষ দুয়ে লক্ষ্মীদেবী, ১২. মাহিষ্মতীরাজ নীলধবজের স্ত্রী। ইনি অত্যন্ত গঙ্গাভক্ত ছিলেন।

সমাধান শব্দরূপ ৫২৩

সঠিক উত্তরদাতা

নীলিমা রায়
নলহাটী, বীরভূম।

■	■	■	কি	■	আ	রা	ম
■	হা	মি	ং	■	ম	■	র
না	■	■	খা	লা	সি	■	ণ
ই	ন	সা	ন	■	■	■	কা
ঘ	■	■	■	ম	র	শু	ম
রে	■	বি	ন	য়	■	■	ড়
খাঁ	■	ধা	■	দা	রু	ণ	■
ই	ম	ন	■	ন	■	■	■

সমাধান শব্দরূপ ৫২৪

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল
নলহাটী, বীরভূম।
শান্তনু গুড়িয়া, বাগনান, হাওড়া
শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

হ	ং	স	ধব	জ	■	■	দি
ব	■	■	■	গ	জা	ন	ন
ন	ল	■	ন	দী	■	■	ক
■	লি	■	■	শ	শ	ধ	র
বা	তা	য়	ন	■	■	নে	■
সু	■	■	র	মা	■	শ	নি
দে	ব	গৃ	হ	■	■	■	র্বা
ব	■	■	রি	ক	থ	ভা	ক

● ৫২৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ নভেম্বর ২০০৯ সংখ্যায়

বন্দেমাতরম্-এ আপত্তি

(৩ পাতার পর)

ভবানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।—আমরা বলি—জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নই—স্ত্রী নাই, সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা—'। উল্লেখ্য বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ গানটি রচনা করেছিলেন ১৮৭৫ সালে। ১৮৮১-৮২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে তিনি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি সংযোজন করেন। আরও উল্লেখ্য ১৮৭৬ সালে 'রাজসিংহ' উপন্যাস প্রকাশিত হলেও সেখানে এই গানটি তিনি সংযোজিত করেন নি। আনন্দমঠ রচিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিদ্রোহই তো ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

১৮৯৬ সালে রহমতুল্লার সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই গানটিতে সুরসংযোগ করে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি গেয়ে শোনান এবং বাকি অংশে সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভগিনী সরলা দেবী। যদিও রচনার পরেই স্বয়ং বঙ্কিমের নির্দেশে এতে সুর সংযোজন করেছিলেন যদুনাথ অর্থাৎ যদুভট্ট। ১৮৭৬ সালে 'দেশমল্লার' রাগে এতে সুর দেন হুগলির গোপালচন্দ্র ধর। ১৯০৫ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হয়েছিল। সেই অধিবেশনে স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বন্দেমাতরম্ এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিকে জাতীয় সংগীত-রূপে গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে এবংজওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে। এবং মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আচার্য কৃপালনীর সম্মতিক্রমে। বন্দেমাতরম্ নিয়ে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উঠেনি, উঠেছিল লীগ-পন্থী মুসলমানদের পক্ষ থেকে। সাম্প্রতিক কালে এ. আর রহমান বন্দেমাতরম্-এ সুরারোপ করলেও মুসলিম মৌলবাদীরা আপত্তি তুলেছেন বন্দেমাতরম্ নিয়ে।

এই বিতর্ক কি আবার দেশ বিভাগের ইঙ্গিত দিচ্ছে!

ভারতের সদস্য থাকা উচিত?

(৩ পাতার পর)

ভারতের দুর্বল, স্বাভিমানহীন নেতৃত্ব ভারতের এই প্রভাবকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা কেবল এশিয়া দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরব থেকেই বিচ্যুত হয়নি, উলটে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঔপনিবেশিক দেশের দাস মানসিকতা বহনকারী দেশ হিসেবে ভারতে পরিচিত হচ্ছে। ভারতের উচিত বৃটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসে বহন না করে, উচিত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসকে পিছনে ফেলে নিজেদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে তোলা যাতে ওই সমস্ত দেশের খেলা, ভাষা, ও দেশীয় পরম্পরার মর্যাদার সঙ্গে স্থান পাবে। কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বিষয়ে আবারও নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে।

লেখক ঃ বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঃ ১৯৫৯ থেকে ২০০৯

বিশাখা বিশ্বাস

৬ সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' উনষাট সাল। বিরোধী দলের সর্বজনমান্য নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন, "নগ্ন দমননীতি, অসত্যভাষণ এবং লাঠি-গুলি-গ্যাস-জেল এবং মিথ্যা প্রচারের দ্বারা কিছুদিন টিকে থাকা যায় কিন্তু বেশিদিন বেঁচে থাকা যায় না" (স্বাধীনতা)। তারপর বছর দশেক মাত্র। দশবছর বাদে ১৯৬৯ সালের এক বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারের সম্মুখের বারান্দায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীরই জামার কলার ধরে টানাটানি করল বাম-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদলেহী কতিপয় অনুচর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবাবু সেদিন আপন দপ্তরে প্রতিবাদে নিস্পৃহ, প্রতিরোধে নিস্ক্রিয়, যেন শান্ত, দান্ত, জিতাত্মা এক ব্যক্তিত্ব।...

তারপর প্রায় অর্ধশতাধিক বৎসর অতিক্রান্তের পর 'স্টার আনন্দে' মমতা ব্যানার্জি বললেন, "বত্রিশ বছর পরে শাসকের তলানিতে পড়ে থাকা কেউ, আগাপাশতলা দুর্নীতিগ্রস্ত, পাঁড় ঝানু চোর-জোচ্চোর, ধর্ষক ও মাফিয়ারাজ কায়েম করে মানুষ মারতে পারেন, কিন্তু রাজ্যকে তিনি বাঁচাতে পারবেন না" (৩-১-০৯)। তারপর মাত্র দশটি মাস। দশমাস পরেই ১৬-১০-০৯ তারিখে রাইটার্সের বারান্দা থেকে অপর চার মন্ত্রী-নেতাকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ফোর্সফুল রিমুভ্যালের অর্ডার দিয়ে 'স্ট্যালিনীয় মাইন্ডসেটের' পরিচয় দিয়েছেন নাট্যবিলাসী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

দুইটি ঘটনার ভেতরে সময়ের সীমানাটুকু বাদ দিলে যা থাকে, তা হলো সেদিন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি সখেদে বলেছিলেন, "আমি এক জঙ্গলের রাজত্বে বর্বর সরকারের মুখ্যমন্ত্রী" (বসুমতী)। এবং এদিন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অর্ডার অব ফোর্সফুল রিমুভ্যালে সই করতে করতে বলেছেন, "রাইটার্সের বারান্দাকে আমি সার্কাসের ময়দান বানাতে পারি না।"

কিন্তু রাজ্যজুড়ে যখন স্বদলীয়,

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বিরোধীপক্ষীয় এবং সাধারণ মানুষ নির্বিচারে প্রতিদিন খুন হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব স্বীকার না করে যখন কেবল বিরোধী সমালোচনা হচ্ছে, যখন সাধারণ নির্বাচনে পর্যুদস্ত হয়ে রাজ্যের একটা বৃহৎ অংশে ১৪৪ ধারা জারি রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো তা তুলে নিয়ে কেবল সিপিআই(এম) দলেরই মাত্র মিটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, যখন বিধায়ক বংশীবদনের গুলিতে আহত মানুষেরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং পুলিশ বিধায়ককে ধরছে না, পরন্তু সেই বিধায়ক মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করে চলেছেন, যখন বিদ্বজ্জনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মোবাইল ফোনে কথাবার্তার সত্য-মিথ্যা ক্লিপিংস দলীয় কর্মীসভায় পেশ করে খোদ মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে চলেছেন, যখন বাম-নেতা অনিল বোসের ধমকের মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বিরোধী দলভুক্ত অভিযুক্তদের ধরে এনে আদালতে উপস্থিত করা হচ্ছে। অথচ আদালতে তিনদিনের মাথায় তারা ছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন---তখন, ১৪৪ ধারার আইন অমান্য না করে যারা কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারের দাবীটিকে জনগণের মধ্যে উচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই মাত্র মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের এই অ্যারেস্টের আদেশকে তখন অনৈতিক এবং অদূরদর্শিতা বলে মনে হলেও, বন্ধুরা দেখো, রক্তে যেন ঢেউ না জাগে।...

ঠেলায় পড়লে যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান সেই জ্যোতি বসুই যেদিন সেই ১৩-৯-৫৯-এ বললেন, ডাঃ রায় গণহত্যার অপরাধে অপরাধী, পার্লামেন্টের উচ্চতর বিচারাশালায় তার বিচার হওয়া দরকার', আজকের মতো কোন বিমান বোস সেদিন বলেননি এসব পাগলের প্রলাপ মাত্র ('স্বাধীনতার' সংশ্লিষ্ট সংখ্যাখানি)। সেই স্বাধীনতা নামক পত্রিকাখানিতে ২৮-৯-৫৯ তাং-এ বাম বিধায়ক সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী যেদিন বললেন, "মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

খাদ্যমন্ত্রী বিধানসভার ভেতরে সহমরণে গেলে রাজ্যটা রক্ষা পায়"---সেদিনও কোনও বিমান বোস সেই সব উক্তিকে 'শিশু-সুলভ' আচরণ বলে আখ্যায়িত করেননি (দ্রঃ স্বাধীনতা)। ২৫-৮-৫৯ তাং-এ জ্যোতি বসু যখন বললেন, "আমি বারবার ডাঃ রায়কে গ্রেপ্তারের যখন দাবী জানাচ্ছি..." ইত্যাদি ইত্যাদি---তখনও কিন্তু রায়-মন্ত্রীসভার কেউ কোনও মন্তব্য করেননি (স্বাধীনতা)। পার্থবাবুরা রাইটার্সে কাউকে কোনও অমর্যাদাকর কথা বলেননি, কোনও আইনকে অমান্য করেননি, কোনও গুপ্তবাণী ফাঁস করেননি---তবু তাদেরই রাইটার্সে হতে ফোর্সফুলি অপসারণ করা হয়েছে, গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দেখেও, বন্ধুরা দেখো, মস্তিষ্কে যেন তরঙ্গ না তোলে।...

সম্ভবত, ১৯৭০ সালের এপ্রিলের ২য় সপ্তাহের কোনও একদিন। ওই দিনই এসপ্লানেড-ইস্টে লেনিনের মূর্তি বসে। লেনিনের জন্মশতবর্ষে ইসকাশোর উদ্যোগে। অজয়বাবু, প্রণববাবু, ভূপেশবাবু, হীরেনবাবু, বিশ্বনাথবাবু প্রমুখের উপস্থিতিতে সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রাজ্যপাল ধাওয়ানজী। না, পাঠকেরা দেখো, রক্তে যেন আগুন না লাগে। কেননা, কোনও সিপিআই(এম) সদস্য সেই সভায় সেদিন গেলেন না---পরন্তু তারা বললেন, "ওখানে সার্কাস হচ্ছে"..."ওখানে যাবেন না"..."আমরা যখন ক্ষমতায় আসব তখন শ্রমিক শ্রেণী নতুন করে লেনিনের মূর্তি বসাবে" ইত্যাদি ইত্যাদি (সেদিন বক্তা ছিলেন কমরেড লক্ষ্মী সেন)।...তারপর সিপিআই(এম) ক্ষমতায় এসেছে, লেনিন বত্রিশ বছরে বিস্মৃত হয়েছেন, জ্যোতি বাবুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত টাটার বন্দনাগীতি চলছে, রাইটার্সের বারান্দায় বুদ্ধের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, "আমি রাইটার্সকে তো সার্কাসের ময়দান বানাতে পারি না।"---বন্ধুরা, দেখো, ধমনী যেন নিরুত্তাপ থাকে।

ভারতীয় কিষাণ সঙঘ পশ্চিমবঙ্গে ৫০ হাজার সদস্য সংগ্রহ করবে

সংবাদদাতা ঃ শিলিগুড়ি।। রাসায়নিক সারে চাষবাসের কুফল সম্পর্কে পাহাড়ের কৃষকরা সমতল অপেক্ষা বেশি সতর্ক সেই কারণে তারা জৈবসারে চাষ আবাদই করছে তা নয়, তার প্রসারের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রশিক্ষণও চলছে ভার্মি কম্পোস্ট সার, গোবরসার ও অন্যান্য সবুজ সারের শিক্ষণ ও সংরক্ষণ কৃষকদের হাতেনাতে শেখানো চলছে। রাসায়নিক ওষুধের বিকল্প দেশী গাইয়ের মূত্র ও নিমপাতার ব্যবহার তারা জেনেছে। গত ২৫ অক্টোবর কালিম্পং-এ ভারতীয় কিষান সঙেঘর এক কর্মীসভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভার আহ্বায়ক স্থানীয় কৃষক ভানুপ্রতাপ থাপা। সভায় সভাপতি নয়ন প্রধানের বক্তব্যে জানা যায়, জৈবসার নিয়ে প্রযুক্তি শিক্ষণ ও প্রসার ত্বঙ্খ-র মাধ্যমে চলছে। এই সভায় ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক অজিত কুমার বারিক এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "গোবর, গো-মূত্রে চাষ-আবাদ এদেশের কৃষিতে একটি প্রাচীন পরম্পরা।"

তিনি আরও জানান দেশের কৃষি ও কৃষকের সমস্যা অনেক ও গুরুতর যার জন্য আজ পর্যন্ত দেশে এক লক্ষ চুরাশি হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে এবং

এখনও করছে। এর প্রতিকারের জন্য না সরকার না জনগণ—কেউ এগিয়ে আসেনি। নন্দনকাননে বাঘ মরলে সারা দেশ শুদ্ধু হইচই করে, প্রধানমন্ত্রী কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন। কৃষক মরলে কারও কিছু হয় না। তাই কৃষকের সমস্যার সমাধান কৃষককেই করতে হবে। এর জন্য দরকার স্থায়ী অরাজনৈতিক ও সর্বভারতীয় একটি কৃষক সংগঠন। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘই হলো এই সংগঠন। তিনি সভায় সকল কৃষককে তাই সংগঠনে যোগদান করার আহ্বান জানান। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান সংগঠিত কৃষকশক্তিও দেশের আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে---অন্য কোনও পথে নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৪ অক্টোবর শিলিগুড়ির মাধব ভবনে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকারিণী সমিতির বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রদেশে ৫০,০০০ সদস্য সংগ্রহ অভিযান সফল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, "যেসব অঞ্চলে অধিক সংখ্যার সদস্য সংগৃহীত হবে সেখানে সকলকে বেশি সময় দিয়ে কাজ করতে হবে।" এই বৈঠকে পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও অখিল ভারতীয় সম্পাদক মোহিনী মোহন মিশ্র উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গে প্রধানাচার্য প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ১২--১৬ অক্টোবর ' বিদ্যাভারতী, উত্তরবঙ্গ শাখার ব্যবস্থাপনায় "প্রধানাচার্য বর্গ", আশ্রমিক পরিবেশে শিলিগুড়ির সারদা শিশুতীর্থ, সূর্যসেন কলোনিতে সম্পন্ন হল। উত্তরবঙ্গের ৫৫টি বিদ্যালয় থেকে মোট ৬৩ জন প্রধানাচার্য ও সহ-প্রধানাচার্য অংশগ্রহণ করেন।

১২ অক্টোবর সন্ধ্যায় সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে বর্গের সূচনা করেন সত্যব্রত সিংহ। উত্তরবঙ্গের সহ-সভাপতি ওমপ্রকাশ আগরওয়াল স্বাগত বক্তব্যে আত্মিক বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

সত্যব্রত সিংহ বলেন, বিদ্যালয়গুলির সুষ্ঠু সঞ্চালনের কেন্দ্রে স্থিত প্রধানাচার্যরা হলেন পরিণত চিন্তার মানুষ। সম্মিলিতভাবে আমাদের কাজে সাধনা করতে হবে তবেই সাফল্য আসবে।

বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী এই বর্গে সম্পূর্ণ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সাইবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে চীন — জি পার্থসারথি

সংবাদাতা-আমেদাবাদ ঃ গুজরাত মিডিয়া ক্লাব আয়োজিত 'চ্যালেঞ্জস্ ফ্রম চায়না অ্যান্ড পাকিস্তান' শীর্ষক একটি আলোচনা চক্রে গত ৩১শে অক্টোবর শনিবার প্রাক্তন কূটনীতিক জি পার্থসারথি মন্তব্য করেন যে চীনের কু-নজর এখন শুধুমাত্র ভারতবর্ষের অন্দরমহল এবং ভারত মহাসাগরে সীমাবদ্ধ নেই, তাদের চোখ পড়েছে সাইবার জগতের দিকেও। যার দ্বারা ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে চীন। ভারত সরকারের প্রতি পার্থসারথির পরামর্শ তাঁরা যেন চীনের সঙ্গে যাবতীয় চুক্তির সময় পরিণতমনস্কতা এবং সংবেদনশীলতার পরিচয় দেন। কারণ চীনের দিক থেকে বিভিন্ন ভাবে এদেশের ওপর আঘাত নেমে আসতে পারে। শ্রীপার্থসারথি ১৯৯৯ সালে কান্দাহার কাণ্ডের সময় ভারতীয় হাই-কমিশনার ছিলেন পাকিস্তানে। সেই প্রসঙ্গে তুলে তিনি আলোচনাচক্রে বলেন, সন্ত্রাসবাদীদের না ছেড়েই হয়ত সংকটের মোকাবিলা করা যেত, যদি দেশ এবং সংবাদমাধ্যম আরও তিন-চারদিন একটু ধৈর্য দেখাত। আমেদাবাদে গত ৩১ অক্টোবর আয়োজিত ওই সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ভারতের দুই প্রতিবেশী, পাকিস্তান ও চীনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে পার্থসারথি বলেন, চীনের এখন নীতিই হলো, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতিকে জিইয়ে রাখা। তাঁর আরও বক্তব্য, পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে সম্পূর্ণ মদত যোগাচ্ছে চীন। সেইসঙ্গে তাঁর আশঙ্কা—চীন পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার অস্ত্র তো বটেই সেই সঙ্গে প্লুটোনিয়াম বিস্ফোরকের ব্যাপারেও যাবতীয় যোগান দিচ্ছে। তিনি এও বলেছেন জাতিসঙেঘর নিরাপত্তা পরিষদে ভারত এই প্রসঙ্গ তুলতে গেলে চীন ও পাকিস্তানের যৌথ পাল্টা প্রতিরোধে গুরুতর এই বিষয়টি সামনে আসতে পারছে না। চীন ও পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী অবস্থান নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের মতো গুরুতর বিষয়টিকে সাবোতাজ করছে বলে জি পার্থসারথি মনে করছেন। যেহেতু বিদেশ নীতি সংক্রান্ত বহু দূরদর্শী অবস্থান নিজের কর্মজীবনে নিয়েছেন তাই তিনি মনমোহন সিং-কে সমর্থন করছেন দলাই লামাকে তাওয়াং পরিদর্শনে অনুমতি দেওয়ার জন্য। মুখে বলছেন—"দলাই লামাকে তাওয়াং পরিদর্শনের অনুমতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঠিক কাজই করেছেন। চীনের মুখোমুখি দাঁড়াবার এটাই একমাত্র পথ।"

Swastika
16 November - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

লস্করের টার্গেটে এবার দিল্লীর ডিফেন্স কলেজ

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ

সংবদদাতা।। ২৬/১১-এর মহাসাড়ম্বরে বর্ষপূর্তি পালনে উদ্যোগী হচ্ছে লস্কর-এ-তৈবা! তাদের এহেন প্রয়াসের লক্ষ্য এখন দেশের গর্বের দিল্লীর ন্যাশানাল ডিফেন্স কলেজ (এন ডি সি), উত্তর ভারতের দু'টি হাইপ্রোফাইল আবাসিক বিদ্যালয় এবং সেইসঙ্গে ২৬/১১-এর মতো বিদেশীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা কিছু পর্যটন কেন্দ্রও। লস্কর তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু স্থির করার ক্ষেত্রে বেছে নিয়েছে এমন কিছু জায়গাকে যেগুলিকে আক্রমণ করলে অনায়াসেই সারা বিশ্বের নজর কাড়া যায়। বিশেষ করে তারা আলাদা করে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করছে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই-কে। এর পেছনে তাদের দুটি উদ্দেশ্য কাজ করছে। প্রথমত, লস্কর চাইছে গত বছর ২৬শে নভেম্বর তারা ওবেরয় গ্র্যান্ড সহ মুম্বাই-এর প্রথম সারির হোটেলগুলিতে যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল তার দগদগে ঘা না শুকোতেই ফের আঘাত হেনে মুম্বাইবাসী ও ভারতবাসীকে পুরোপুরি ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা। এর ফলে একদিকে যেমন ২৬/১১-এর বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা যাবে তেমন ২৬/১১-এর ঘটনার আসামী আজমল কাসভকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে নরম মনোভাব নিয়েছে (জেলে কাসভের জামাই-আদরই তার প্রমাণ) তারও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাইছে লস্কর।

এমনকী যে পদ্ধতিতে তারা মুম্বাই-এ গতবার হানা দিয়েছিল এবারও সেই একই পদ্ধতি লস্কর প্রয়োগ করতে পারে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। দ্বিতীয়ত, এই আর্থিক মন্দার বাজারে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই যত আঘাতপ্রাপ্ত হবে, দেশের অর্থনীতি ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উপরিউক্ত যাবতীয় তথ্যই উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি বিশেষ সূত্র থেকে। সেই সূত্র বলছে—দিল্লীর একদম প্রাণকেন্দ্র ত্রিশ জানুয়ারী মার্গ-এর গান্ধী স্মৃতির বিপরীতে হামলা চালানোর গুরুতর পরিকল্পনার কথা একপ্রকার জেনে ফেলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর। ঘটনা হলো, লস্করের দুই ব্যক্তি গত সেপ্টেম্বরে ডেনমার্ক সহ অন্যান্য টার্গেট এমনকী দিল্লীর এন ডি সি'তে (National Defence College) আক্রমণের পরিকল্পনা করার সময় তা কর্ণগোচর হয় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ বি আই-এর। লস্করের ওই দুই ব্যক্তির নাম ডেভিড কোলেম্যান হ্যাডলি ওরফে দাউদ গিলানি এবং তাহাউর রানা। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান করে এফ বি আই।

গত ৩রা নভেম্বর চিকাগো আদালতে বিচার চলাকালীন অবস্থায় মার্কিন সরকারপক্ষের আইনজীবী বলেন, ওই দুই ব্যক্তি কাস্টডিতে দাঁড়িয়ে দিল্লীর ন্যাশানাল ডিফেন্স কলেজ সহ ভারত ও ডেনমার্কের পাঁচটি স্থানে হামলা চালানোর পরিকল্পনার কথা আলোচনা করছিল। এফ বি আই-এর বক্তব্য, এর আগেও তারা 'ডিফেন্স কলেজ'-কে সম্ভাব্য আক্রমণ শানানোর তালিকায় রেখেছিল। কিন্তু এভাবে একেবারে নির্দিষ্ট করে ফেলেনি। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, তারা দিল্লীতে আত্মঘাতী জঙ্গিবাহিনীর স্লিপার সেলগুলো ধরে ফেলায় জঙ্গিরা হামলা চালানোর জন্য টুরিস্ট স্পট হিসেবে বেছে নিয়েছে—গোয়া এবং কেরলের পর্যটন কেন্দ্রগুলোকে।

অন্যদিকে ক্রমাগত তালিবানী হানায় জর্জরিত পাক সরকারের গ্রহণযোগ্যতা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই লক্ষ্যমুখ ঘুরিয়ে দিতেই তারা এসব কাজে লস্করকে মদত যোগাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান।

দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন পার্কে গো-পূজন করছেন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্যরা।

বক্তব্য রাখছেন বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সর্বভারতীয় সভাপতি ডাঃ নগেন্দ্র, বসে প্রজ্ঞানন্দ গিরি, রাঙ্গাঠাকুর মহারাজ, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ও রামবিলাস বেদান্তি।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com